যন্ত্রযুগের নেপোলিয়ন

হেনরী ফোর্ড

শ্রীরাধেশচন্দ্র রায় প্রণীত

শিশু সাহিত্য মন্দির
সকল রকম পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
[illegible] নীলমণি দত্ত লেন,
কলিকাতা।

দাম ১।০

প্রকাশক :—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
শিশু সাহিত্য মন্দির।
১৭ নং নীলমণি দত্ত লেন,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—
শিশু সাহিত্য মন্দির।
১৭ নং নীলমণি দত্ত লেন, কলিকাতা।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

এস, গুপ্ত এণ্ড সন্স
২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

প্রফুল্ল লাইব্রেরী
৭১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

লেক বুকষ্টল
লেক রোড

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

প্রিণ্টার :—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৭ নং নীলমণি দত্ত লেন,
কলিকাতা।

"Were I a dictator, like Lenin or Mussolini, I would issue a ukase to the effect that every Member of the House of Commons, and especially every Cabinet Minister, every Labour Leader, every employer and all the Trades Unionists, Socialists, Protectionists, Free Traders, Fascists, Communists, manufacturers, merchants, yellow-bellied Liberals, and blue-nosed Tories should pass an examination in this book (My Life and Work—Henry Ford.)

"I would have it read aloud in the churches, chapels, political clubs, exchanges, council schools twice daily, and it should be chanted on high days and holidays."

—***Robert Blatchford.***

ভূমিকা

জীবন-চরিত লেখায় বাঙালী পাকিয়া উঠিতেছে। জীবন হইতে জীবন আমদানী করিবার ব্যবসায় বাঙালী লেখকদের ওস্তাদি বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। একালের বাঙালী জীবন চরিত-লেখকেরা জীবন গড়িবার কর্ম্মকৌশলে সুপটু।

এই বইয়ে শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র রায় জীবনের হাটে-বাজারে সওদাগরি করিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় পাকড়াও করিতেছি জীবনীশক্তির কেন্দ্রে-কেন্দ্রে চলাফেরা করার অভ্যাস। বইটার ভিতর তিনি বাঙালী জাতির ছেলে-বুড়াকে মেয়ে-পুরুষকে গড়িয়া-পিটিয়া খাড়া করিবার যন্ত্রপাতি বিস্তর আনিয়া হাজির করিয়াছেন। নয়া বাঙালার নরনারী "হেন্‌রী ফোর্ড"—কেতাবের গ্রন্থকারকে বাঙালী জাতির অন্যতম গঠনকর্ত্তারূপে সম্বর্দ্ধনাযোগ্য বিবেচনা করিবে।

হেন্‌রী ফোর্ড মার্কিন বীর, একালের ইয়াঙ্কিস্থানের প্রতিনিধি,—জবরদস্ত প্রতিনিধি। মার্কিন বাচ্চাদের ভিতর সেকালের হুইটম্যান যে চীজ, একালের ফোর্ড সেই চীজ,—অবশ্য নিজ নিজ কোঠের ভিতর। উভয়েই মার্কিণাত্মার বিপুল মূর্ত্তি। হুইটম্যান খাইয়া বাঙালীজাতি বাড়্‌তির পথে আগুয়ান হইয়াছে। কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সেই বাড়্‌তির চিহ্লোৎ দেখিতে পাই। রাধেশচন্দ্রের ফোর্ড খাইয়াও বাঙালী জাতি বাড়্‌তির পথেই আরও আগুয়ান হইতে পারিবে।

ইতিমধ্যে সাহিত্যশিল্পী বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী "আব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন" ও "জেমস্‌ গারফীল্ড" বইয়ে দুই-দুইটা মার্কিন কর্ম্মবীরকে বাঙালীর পাতে-পাতে পরিবেষণ করিয়া যুবক বাঙলার জীবনে শালশা সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। বাঙালী জাতির জীবন-স্পন্দনে আমেরিকার দান অসীম। রাধেশচন্দ্রও আমেরিকাকে দুহিয়া বঙ্গজননীর পুষ্টিসাধন করিলেন।

যুবক বাঙলার পাঠশালায়-পাঠশালায় কবি হেমচন্দ্রের

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়"

অরণ্যে রোদনে পরিণত হয় নাই। জয় হেমচন্দ্রের জয়। আর জয় একালের যুবক বাঙলার।

হেন্‌রী ফোর্ড যন্ত্রবীর। যুবক বাঙলার রক্ত চায় একালে যন্ত্রপাতির শালশা। সেই শালশাও রাধেশচন্দ্র বাঙালী সমাজে প্রচুর পরিমাণেই বাঁটিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বইটার আগাগোড়া লোহালক্কড়ের গীতা বিশেষ। এই শালশার সুফল অল্পকালের ভিতরই বঙ্গ-সাহিত্যে আর বঙ্গ-সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে।

হেন্‌রী ফোর্ড মোটর-বীর। একালের দুনিয়ায় যে সকল শক্তির দৌলতে নতুন ঢঙের শিল্প-যুগান্তর,—"দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব",

সাধিত হইতেছে, সেই শক্তি সমূহের আবহাওয়ায় দেখিতে পাই নয়া নয়া যানবাহন আর নয়া নয়া সড়ক,—বিজলীর তেজ আর মোটরগাড়ীর দিগ্‌বিজয়। সেই নয়া যানবাহনের অন্যতম জগদ্‌গুরু বা যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি এই মার্কিন বীর ফোর্ড। আর তাঁহারই মর্ম্মবাণী, স্কুলের কথা, ঘরের কথা আর ভিতরকার কথা কায়দা করিয়া নিংরাইয়া বাহির করিয়াছেন বাঙালী রাধেশ চন্দ্র। "দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের' অন্যতম জন্মদাতাকে যে লেখক বাঙালী সমাজের ঘরে-ঘরে পরিচিত করাইয়া দিলেন সেই লেখককে বাঙালী জাতি বড় শীঘ্র ভুলিবে না।

হেন্‌রী ফোর্ড "যুক্তি' -বীর। "র‍্যাশন্যালিজেশন" বা "যুক্তিযোগ" ফোর্ডের শ্বাসপ্রশ্বাস বিশেষ। কারখানা চালাইবার কাজে বাজে খরচ নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। মজুর-কেরাণীর হাড়মাসের অপব্যবহার বা দুর্ব্ব্যবহার নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। বাজারে মাল ফেলিবার ব্যবসায় আর দোকানদারিতে পয়সার অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়, মেহনতের অপব্যয় নিবারণ করিতেও সে ওস্তাদ। এই সকল রকমারি বরবাত-নিবারণের কর্ম্মকৌশল একালে "র‍্যাশনাল" বা "যুক্তিনিষ্ঠ" উপাধি লাভ করিয়াছে। "দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের" এক বড় খুঁটাই হইল এই "যুক্তিনিষ্ঠা"। রাধেশচন্দ্র যুক্তিযোগের অন্যতম অবতারকে বাঙালী চাষীবণিক-শিল্পীর দুয়ারে দুয়ারে পৌছাইয়া দিলেন। বাঙলার নরনারী তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিল।

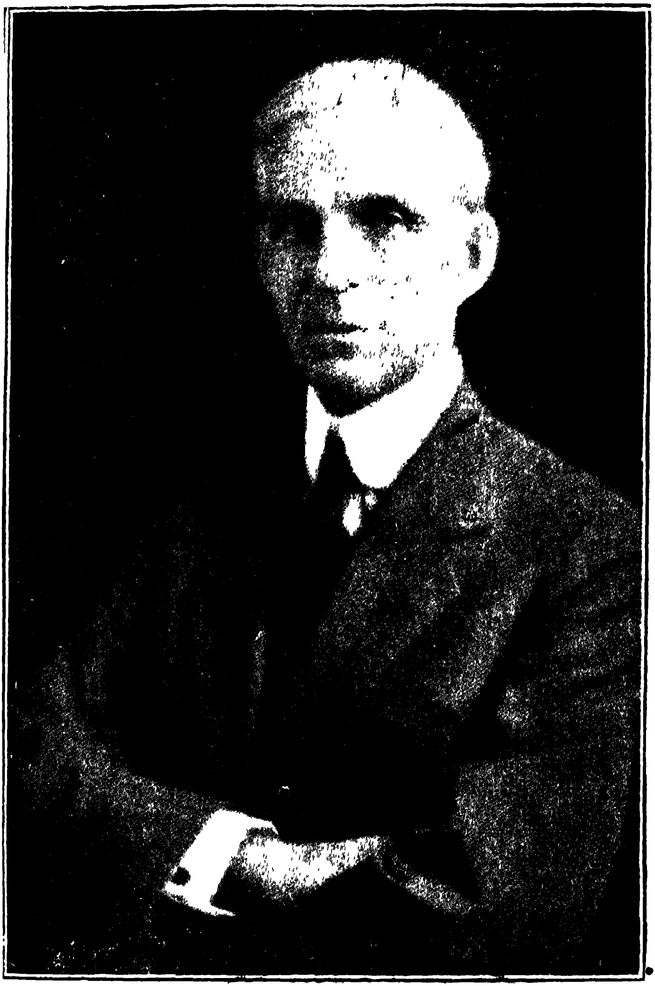
হেনরী ফোর্ড মজুর-কেরাণীদের সুখদুঃখে দরদী বেপারী-বীর। মজুর-কেরাণীর শক্তি-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা সাধনের কাজে ফোর্ডের

মগজ খেলিয়াছে বিস্তর। মেহনতের "তঙ খা"'র হার বাড়াইয়া ফোর্ড প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার শিল্প-সংসারে সফলতার নতুন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। অধিকন্তু পাড়াগাঁয়ের চাষীর কাজকর্ম্মের সঙ্গে শহুরে কারবারের সহযোগ কায়েম করাও ফোর্ড-নীতির মস্ত কীর্ত্তি। হেনরী ফোর্ডের জীবনী-লেখক বাঙালী জাতিকে সমাজ-সংস্কারের নানা পথ খুলিয়া ধরিলেন। নয়া বাঙলার মজুর-সেবকেরা, চাষী-সেবকেরা মধ্যবিত্ত সেবকেরা আর পল্লী-সেবকেরা গ্রন্থকারের নিকট অনেক তাজা-তাজা হদিশ পাইবেন।

রাধেশচন্দ্র পাকা লেখক। লোহালক্কড়কে দিয়া কথা কওয়াইবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। ফোর্ডজীবনের ঘটনাগুলাকে তিনি সাজাইয়াছেন নিজের খেয়াল মাফিক। আর আসল কথা, লেখকের পাল্লায় পড়িয়া হেনরী ফোর্ড নিজ জীবনের নানা কথা বাঙলার নরনারীর নিকট খুলিয়া ধরিতে বাধ্য হইয়াছেন। জীবন চরিত রচনার এই কায়দায় রাধেশচন্দ্র বিনোদবিহারী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পথের পথিক। এই পথ পাঠকমাত্রকে পুলকিত করিবে।

কলিকাতা　　　　শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৪।



মিঃ হেনরী ফোর্ড

১৯২১ সালের ৩১শে মে তারিখ ফোর্ড কোম্পানীতে তৈয়ারী গাড়ীর সংখ্যা হইল পঞ্চাশ লক্ষ। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৩ সালে প্রথম যে গাড়ীখানা তৈয়ারী করিয়াছিলাম সেই গাড়ীর সঙ্গে উক্ত নম্বরের গাড়ীখানাও আমার মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। আকারে প্রকারে গাড়ী দু'খানির পার্থক্য অনেক কিন্তু মূলতঃ কল কব্জার কারিগরি প্রায় এক। অবশ্য আমাদের আধুনিকতম গাড়ীগুলি তৈয়ারী করিবার সময় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছি কি করিয়া সেগুলিকে খুব আরামদায়ক করা যায় এবং উহাদের কলকব্জা খুব সহজ ও মজবুত হয়। কারখানায় কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্ত্তনগুলি স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িয়াছে। আমি হাতে-কলমে কাজ করিয়া বুঝিয়াছি, কোন কাজ আরম্ভ করিলে যথাসম্ভব তাহা পূরণ করাই ভাল। এবং ভাল করিয়া করিতে হইলে একজনের পক্ষে একটা কাজই যথেষ্ট।

১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই মিসীগানের অন্তর্গত ডিয়ারবর্ণের একটা কৃষিক্ষেত্রে আমার জন্ম হয়। ছেলেবেলার কথার মধ্যে এইটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, কৃষিক্ষেত্রে খুব বেশী রকম পরিশ্রম করিতে হইত। সেই পরিশ্রমের ভয়টা এখন পর্য্যন্ত আমার মন হইতে দূর

হয় নাই। শুনিতে পাই আমার বাপ-মা খুব গরীব ছিলেন। অতি কষ্টে তাঁহাদের দিন চলিত। কিন্তু আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহারা অবশ্য ধনী ছিলেন না, তাই বলিয়া গরীবও তাঁহাদের বলা চলে না। বরং মিসীগানের অন্যান্য কৃষকদের অবস্থার তুলনায় আমাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল।

কৃষিক্ষেত্রের কঠিন পরিশ্রম দেখিয়া সর্ব্বদা আমার মনে হইত কি করিয়া এই শ্রমের লাঘব করা যায়। এখান হইতেই কলকব্জার ভাব আমার মাথায় ঢুকে। কিন্তু আমার মা বলিতেন যন্ত্র শিল্পের মেধা লইয়াই নাকি আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে বয়সে ছেলেপেলেরা পুতুল খেলে সেই বয়সে আমার খেলার জিনিষ ছিল নানা রকমের ভাঙ্গা লোহা-লক্কড। ভাঙ্গা কলকব্জার টুক্‌রা টুক্‌রা অংশগুলি ছিল আমার অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। অবশ্য এখনকার মত সেদিনে এত রকমের পুতুলও পাওয়া যাইত না। ভাঙ্গা কুড়াইয়া-পাওয়া লোহার টুক্‌রা দিয়া আমার থাকিবার ঘরটিকে বোঝাই করিয়া উঠাইয়াছিলাম।

ছেলেবেলার স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে আর একটা কথা আমার এমন পরিষ্কার মনে পড়ে যেন উহা সেদিনের ব্যাপার মাত্র। তখন আমার বয়স বার বৎসর। মা বাবার সঙ্গে গাড়ী করিয়া সহরে যাইতেছিলাম। পথে দেখিলাম একটা ইঞ্জিন চলিয়াছে। যন্ত্রচালিত গাড়ী সেই আমি প্রথম দেখি। আমার স্পষ্ট মনে আছে ইঞ্জিনখানি ব্যাটেল ক্রিকের নিকলাস সেফার্ড কোম্পানীর তৈয়ারী—প্রথমেই আমি নামটা দেখিয়া লইয়াছিলাম। আমাদের গাড়ীকে রাস্তা দিবার জন্য ইঞ্জিনখানা একটু থামিতেই আমি গাড়ী হইতে নামিয়া

ড্রাইভারের সঙ্গে যাইয়া আলাপ জুড়িয়া দিলাম। ড্রাইভারও পরম উৎসাহে ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি আমাকে বুঝাইতে লাগিল। আমার ন্যায় অল্প বয়স্ক বালকের ইঞ্জিন সম্বন্ধে এত ঔৎসুক্য দেখিয়া তাহার একটু বিস্ময়ও লাগিয়াছিল। কত শত বালক বালিকাই তো অহরহ ইঞ্জিনের চারিদিক ঘিরিয়া থাকে, কিন্তু উহার কলকব্জা সম্বন্ধে খবরের তাহাদের কি প্রয়োজন?

ইহার পর হইতে দিনরাত আমার মাথায় কেবল ইঞ্জিনের চিন্তাই গজগজ করিতে লাগিল। নিকলাস সেফার্ডের ইঞ্জিন আমাকে পাইয়া বসিল। তখন হইতেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম কি করিয়া এই রকমের একটা ইঞ্জিন তৈয়ারী করা যায়। কয়েক বৎসর চেষ্টার পর একটা ইঞ্জিন তৈয়ারীও করিয়াছিলাম।

এই সময়কার আর একটা কথা আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে। সেই দিন হাতে একটা ঘড়ি পাইলাম। ইঞ্জিন দেখা ও ঘড়ি পাওয়া একই বৎসরের কথা। অনেক সময় ভাঙ্গা ঘড়ি যোগাড় করিয়া আমি মেরামত করিতে চেষ্টা করিতাম। তের বৎসর বয়সের সময় একটা ঘড়ি নিজের হাতে মেরামত করিয়াছিলাম। ঘড়িটা সময়ও বেশ ঠিক দিয়াছিল। পনের বৎসর বয়সের সময় ঘড়ি মেরামতে আমি প্রায় ওস্তাদ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন যে-কোন রকমের ঘড়ি মেরামত করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার যন্ত্রপাতি-গুলি ছিল সবই মোটা রকমের।

কৃষিক্ষেত্রের কাজ আমার কোন দিনই ভাল লাগিত না। বাবা আবার আমার যন্ত্রপাতি লইয়া নাড়াচাড়া পছন্দ করিতেন না। সতের বৎসর বয়সে স্কুল ছাড়িয়া যখন শিক্ষানবীশ

হিসাবে ড্রাইডক ইঞ্জিন ওয়ার্কসে ঢুকিলাম তখন বাবা আমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা ছাড়িয়া দিলেন। ড্রাইডক ইঞ্জিন ওয়ার্কস্ হইতে ঠিকমত পাশও করিলাম কিন্তু আমার ঝোঁক রহিল সেই ঘড়ি মেরামতের দিকে। তখন ঘড়ির দাম ছিল খুব বেশী। সাধারণের পক্ষে ঘড়ি ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলাম খুব সস্তায়—অন্ততঃ দুই টাকা আড়াই টাকা দামে ঘড়ি বাজারে চালাইব। এই মতলব করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াও দিয়াছিলাম। কিন্তু কেন যেন মনে হইল ঘড়ির এত প্রয়োজনীয়তা কি? ঘড়ি তো অনেকের না হইলেও চলে! এই ভাবিয়া ঘড়ির ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিলাম। তখন হইতেই শুধু ভাবিতাম এমন একটা কোন জিনিষ তৈয়ারী করা চাই যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশীলোকের ব্যবহারে আসে। তাই বলিয়া ঘড়ি তৈয়ারী করা ছাড়িলাম না। তখন দেশে চল্‌তি ছিল 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' সময়। আমি নূতন রকমের একটা ঘড়ি তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহাতে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'লোকাল' উভয় সময়ই দেখা যাইত। আমার এই নূতন ঘড়িটা এই অঞ্চলে একটা দেখিবার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ড্রাইডক ইঞ্জিন ওয়ার্কসে শিক্ষানবীশী শেষ করিয়া সেনেকটাকির ওয়েষ্টিং হাউস কোম্পানীতে ইঞ্জিন মেরামতির কাজ লইয়া চাকুরীতে ঢুকিলাম। এখানে কাজ করিয়া ইঞ্জিন সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা আমার মাথায় আসিতে লাগিল।

অনেকদিন হইতেই মনে করিতেছিলাম রাস্তায় চলাচলের জন্য ষ্টীম ইঞ্জিন চালিত একরকম গাড়ী তৈয়ারী করিব। ওয়েষ্টিং হাউসে

কাজের অভিজ্ঞতা এই মতলবে আমার অনেকটা সহায় হইল। তখন আমাদের বাড়ীতে ছোটখাটো একটা ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছি। এই কারখানায় একখানা গাড়ী তৈয়ারী করিয়া ফেলিলাম। গাড়ীখানি ষ্টীমে চলিত। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল ষ্টীমে চালিত গাড়ী রাস্তায় চলাচল অথবা দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। তাই ষ্টীমের গাড়ী তৈয়ারীর কল্পনা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু কলের গাড়ী তৈয়ারীর নেশা তখন আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব। তখন ঝুঁকিয়া পড়িলাম গ্যাস ইঞ্জিনের দিকে। একটা বিলাতী গ্যাস ইঞ্জিন দেখিবার সুযোগও ঘটিয়া গেল।

১৮৮৫ সালে ডেট্রয়েব ঈগল আয়রণ ওয়ার্কসে মেরামতির জন্য একখানা 'অটো' গ্যাস ইঞ্জিন আসিল। ইঞ্জিন খানি বিলাতী, স্থানীয় কেহ এই ইঞ্জিন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না। আমার একটা নাম ডাক ছিল যে, 'অটো' ইঞ্জিন মেরামতির কাজে আমি একজন বিশেষজ্ঞ। আমার ডাক পড়িল এবং চেষ্টা করিয়া ইঞ্জিনখানি ঠিকও করিলাম। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে এই ইঞ্জিন সম্বন্ধে অনেক পুঁথিপত্র ঘাটাঘাটি করিয়াছিলাম। সেই পুঁথিপড়া বিদ্যাটা এবার কাজে লাগিয়া গেল। 'অটো' ইঞ্জিনের অনুকরণে পরে আমি একটা ইঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনের মত হয় নাই। জনৈক যুবক—তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি—উহা আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছি সে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

গ্যাস ইঞ্জিনের পরিকল্পনা আমার কথা হইতে প্রথম উদ্ভূত হয় নাই। উহার বহুপূর্ব্ব হইতেই গ্যাস ইঞ্জিনের চলন হইয়াছিল।

অটো ইঞ্জিনই তাহার প্রমাণ। কিন্তু গ্যাস চালিত ইঞ্জিন ও গাড়ী জনসাধারণের দৈনন্দিন কার্যো প্রচলনের কল্পনা আমিই প্রথম করি। এই লাইনে বিজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা কেহই আমার এই কল্পনাকে আমল দেন নাই। সকলেই বলিতেন ষ্টীম ইঞ্জিনের সঙ্গে গ্যাস ইঞ্জিন কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সব কাজেরই একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার নজির দেখাইয়া সেই সীমাকে দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে করেন। এই স্বভাবটা তাহাদের যেন মজ্জাগত; স্বকল্পিত গণ্ডীর বাহিরে তাহারা নিজেরা তো পদক্ষেপ করেনই না এবং অন্যেও সেই গণ্ডী অতিক্রম করে তাহা পছন্দ করেন না। ব্যবসার বাজারে প্রতিযোগিতায় নামিতে হইলে আমাকে হয়তো বা পারদর্শী ব্যক্তিদের পরামর্শ লইতে হইত এবং তাঁহারাও নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে এমন উপদেশ আমাকে দিতেন যাহার ফলে আমাকে আর কাজের পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইত না। কিন্তু নিজেকে আমি সর্ব্বদা সেই আওতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। ফোর্ড কোম্পানীতে আমি বিশেষজ্ঞদের কখনও নিযুক্ত করি নাই।

ঈগল আয়রণ ওয়ার্কসের কাজের পর পিতার কৃষিক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম—ক্ষেত্রে কাজ করিবার আশায় নহে, বাড়ী ফিরিলে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কাজে সুবিধা হইবে মনে করিয়া। তখন বাড়ীতে সুন্দর ছোটখাটো একটা কারখানা তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছি। আমার কারখানা দেখিয়া তখন আর কেহ ঠাট্টা করিতে পারিত না। বাবাও বলিলেন, যন্ত্রপাতি লইয়া সময়ের অপব্যবহার না করিলে তিনি আমাকে চল্লিশ বিঘা পরিমাণ কাঠের গড় কিনিয়া দিবেন। প্রস্তাবটা

আমার বিশেষ মন্দ বলিয়া মনে হইল না। ভাবিয়া দেখিলাম এই সম্পত্তিটা পাইলে শীঘ্রই একটা বিবাহের সুযোগও ঘটিতে পারে। বাবার প্রস্তাবে রাজী হইলাম এবং করাত কল ও ইঞ্জিন আনিয়া কাঠ কাটিতে লাগিয়া গেলাম। কাঠের গড়ের সন্নিকটে একখানা ছোট বাড়ীও তৈয়ারী হইল। এখানেই সুরু হইল আমার বিবাহিত জীবন। নূতন বাড়ীর নিকটে আমার কারখানা উঠাইয়া আনিতে ভুলিলাম না। গাছকাটার পর অবসর সময়ে গ্যাস ইঞ্জিনের কাজে লাগিয়া যাইতাম। কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট বাড়িতে লাগিল। এই সময়টায় ইঞ্জিনের কল কব্জা সম্বন্ধে বইও পড়িয়াছি প্রচুর।

১৮৯০ সালে কাঠের গড়ের কারখানায় গ্যাস ইঞ্জিনের উপর আমার দ্বিতীয় পরীক্ষায় হাত দিলাম। ঠিক সেই সময় ডেট্রয় ইলেকট্রিক কোম্পানী হইতে ইঞ্জিনিয়ারের পদের জন্য ডাক আসিল। বেতন মাসিক ৪৫ ডলার। নানাদিক ভাবিয়া চাকুরী গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। প্রথমতঃ দেখিলাম কাঠের কাজে যে আয় হইত চাকুরীতে আয় হইবে তাহা অপেক্ষা বেশী; তাহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ও কাঠের গড়ের কাজ 'যেন তেন প্রকারেণ' ছাড়িয়া যাওয়াই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য। এদিকে গাছ কাটার কাজও তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

ডেট্রয়ে বাগ্লি এভিনিউতে আমরা একটা বাড়ী ভাড়া করিলাম। আমাদের নূতন বাড়ীর পেছনে একটা পাকা ঘরে আমার কারখানাটিকেও উঠাইয়া আনা হইল। প্রথম কাজে যোগ দিতেই আমার 'ডিউটি' পড়িল রাত্রিতে। রাত্রের ডিউটির পর দিনে ইঞ্জিনের

কাজ করিতে সময় পাইতাম না। ইহার কয়েকদিন পরেই আমার হাজিরার সময় হইল দিনে। তখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া আমার কাজ করিতাম। শনিবার প্রায় সমস্ত রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইতাম। এত খাটুনিতেও ক্লান্তি বোধ হইত না। প্রকৃত উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যে কাজ করা যায় তাহাতে ক্লান্তি আসিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবেই। কিন্তু দেখিয়াছি আমার চেয়ে আমার স্ত্রীর উৎসাহ ও বিশ্বাস ছিল আরও বেশী।

১৮৯২ সালে আমার মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিবার চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু গাড়ীখানিকে রাস্তায় আমার মনোমত করিয়া চালাইতে আরও কয়েক মাস লাগিয়াছিল। গাড়ীখানি দেখিতে হইল অনেকটা 'বগি' গাড়ীর মত। গাড়ীর কাঠামো ও সিট ইত্যাদি কিনিয়া লইয়াছিলাম, চাকাগুলি ছিল সাইকেলের। ইঞ্জিনের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিজে তৈয়ারী করিয়াছিলাম। গাড়ী তৈয়ারীর সময় সব চেয়ে বেশী বেগ পাইতে হইয়াছে উপযুক্ত সরঞ্জামাদির অভাবে। যন্ত্রপাতি খুঁজিয়া বেড়াইবার মত সময় কিংবা কিনিবার মত অর্থ মোটেই ছিল না। কিন্তু কাজের সময় প্ল্যান লইয়া আমাকে বেগ পাইতে হয় নাই। যে কাজেই হাত দেই তাহার প্ল্যান আমি আগে হইতেই পাকাপাকি ভাবে করিয়া রাখি। তাহা না করিলে কাজের সময় মাঝ দরিয়ায় আটকাইয়া যাইতে হয়। অনেকে নূতন কিছু করিতে যাইয়া ঠেকিয়াছেনও এই ভাবে। ইঞ্জিনের প্ল্যান ও গাড়ীর নক্সা আমি আগেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। ১৮৯৩ সালে আমার গাড়ী অনেকটা পছন্দ মত হইয়া রাস্তায় চলিতে লাগিল।

—দুই—

আমার তৈয়ারী গাড়ীখানাই ছিল ডেট্রয়ে প্রথম মোটর। ইহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ডেট্রয়ে অন্য কোন মোটর গাড়ী আমদানী হয় নাই। কিন্তু আমার মোটরখানা লোকের কাছে একটা আবর্জ্জনা বিশেষ ছিল। পথে চলিবার সময় ইঞ্জিন এমন ভীষণ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিত যে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইত। পথে ঘোড়াগুলি ভয়ে চমকিয়া উঠিত। আমাকেও গাড়ী লইয়া কম ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয় নাই। যেখানে গাড়ী থামাইতাম সেখানে লোকের ভিড় জমিয়া যাইত; কখনও সামান্য সময়ের জন্য গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছি তো কোন বেপরোয়া উৎসাহী যুবক গাড়ী চালাইতে চেষ্টা করিয়া দিয়াছে। পরে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে গাড়ীখানাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য আমাকে সর্ব্বদা একটা শিকল সঙ্গে লইতে হইত। ইহার উপর ছিল আবার পুলিশের গোলমাল। তখন পথ চলিবার সময় গাড়ীর বেগ সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। কিন্তু গাড়ী চালাইবার জন্য আমি মেয়রের নিকট হইতে একটা অনুমতিপত্র লইয়াছিলাম। এই অনুমতিপত্রকে এখনকার কথায় 'লাইসেন্স' বলা যাইতে পারে। অতএব বলা যায়, আমি ছিলাম আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম লাইসেন্স-প্রাপ্ত মোটর ড্রাইভার।

দেখি নাই কিংবা উহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আমার বিশ্বাস বৈদ্যুতিক শক্তিকে যত প্রকার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে এখন পর্য্যন্ত তাহার অর্দ্ধেক কাজেও উহা ব্যবহৃত হয় নাই। বৈদ্যুতিক শক্তির যেমন একটা ক্ষেত্র রহিয়াছে, গ্যাস ইঞ্জিনেরও তেমন ক্ষেত্র রহিয়াছে। একের কাজ অন্যের দ্বারা চলে না। উভয়ের আবিষ্কার বিজ্ঞান ও শিল্পের চক্ষে বরং মঙ্গলজনকই হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই সময় ডেট্রয় এডিসন কোম্পানী আমাকে জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু একটা সর্ত্ত দিলেন যে চাকুরী করিতে হইলে আমাকে গ্যাস ইঞ্জিনের কাজ ছাড়িতে হইবে। আমি মহা-সমস্যায় পড়িয়া গেলাম—চাকুরী ছাড়ি কি গ্যাস ইঞ্জিন তৈয়ারী করা ছাড়ি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলাম গ্যাস ইঞ্জিনের দিকেই মন দিব, চাকুরী করিব না। আমার বিশ্বাস ছিল গ্যাস ইঞ্জিনের কাজে আমার সাফল্য সুনিশ্চিত। ১৮৯৯ সালের ১৫ই আগষ্ট চাকুরী ছাড়িয়া মোটর ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়া গেলাম।

বিবেচক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হয়তো বলিবেন, চাকুরী ত্যাগ করা আমার পক্ষে খুব কাঁচা কাজ হইয়াছে। হাতে তখন একটা পয়সাও নাই। সংসার খরচের পর চাকুরীর টাকার যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা সবই ব্যয় হইত গ্যাস ইঞ্জিনের কাজে। এই অবস্থায় কি খাইয়াই বা থাকি, ব্যবসাই বা করি কি উপায়ে? আমার পত্নীর সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলাম। তিনি বলিলেন, "মোটর তৈয়ারীর কাজ কিছুতেই ছাড়া যাইতে পারে না। এজন্য হয় মরিব, না হয় বাঁচার মত বাঁচিব।"

তারপর আর একটা বাধার কথা। সে সময় মোটরের চাহিদা মোটেই ছিল না। এক্ষণে বাজারে এরোপ্লেনের যে অবস্থা, তখন মোটরের ছিল প্রায় সেই অবস্থা। ঘোড়াছাড়া গাড়ীকে তখন অনেকেই মনে করিতেন খেলার পুতুল বলিয়া। মোটরের যে একটা ব্যবসা চলিতে পারে তাহা কাহারও ধারণায় আসিত না। মোটরের প্রতি অশ্রদ্ধা বোধ হয় এখনও অনেকের রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ, বলিয়া থাকেন, "মোটর গাড়ী তো বিলাসিতার সামগ্রী মাত্র, এ'র আবার প্রয়োজনীয়তা কি? তবু কৃষিক্ষেত্রে জমি চাষের জন্য সময়ে সময়ে ইহার প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে।" নেহাৎ উদারতা বশতঃই তাঁহারা শেষ কথাটা স্বীকার করেন। মোটর যে কালে শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায় হইতে পারে অনেকেই তাহা ভাবিয়া দেখেন না। মোটরের উপর শ্রদ্ধাও যাহাদের ছিল, তাঁহারা মনে করিতেন ইহা সাইকেলের উন্নত সংস্করণ মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক যখন দেখা গেল মোটরেরও ব্যবসা চলিতে পারে তখন সকলের দৃষ্টি পড়িল উহার গতির দিকে—ইহাকে কত দ্রুতগামী করা যায়। মোটর শিল্প এজন্য প্রথমতঃ উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহার উন্নতির দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। ব্যবসা বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম আমাকেও মোটরের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। মোটকথা তখন এই ব্যবসাটা ছিল অনেকটা ফট্‌কা খেলার মত।

আমার চাকুরী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কতিপয় ব্যক্তি আমার তৈয়ারী গাড়ীর ব্যবসা করিবার জন্য ডেট্রয় মোটর কোম্পানী নাম দিয়া একটা কোম্পানী খুলিলেন। আমি হইলাম কোম্পানীর চীফ

ইঞ্জিনিয়ার। কোম্পানীতে সামান্য সেয়ারও আমার ছিল। তিন বৎসর কোম্পানীর কাজ চলিল। গাড়ীগুলি তৈয়ারী করা হইল আমার প্রথম গাড়ীর অনুকরণে, কিন্তু বিক্রয় হইল খুব কমই। আমার অংশীদারদের ইচ্ছা ছিল যত বেশী দামে গাড়ী বিক্রয় করা যায় ততই ভাল। অনেক বুঝাইয়াও গাড়ীর মূল্য কমাইবার জন্য তাহাদের সম্মত করিতে পারিলাম না। আমি তো ছিলাম ইঞ্জিনিয়ার মাত্র, ইহার অধিক আমি আর কি করিতে পারি! কোম্পানীর ডিরেক্টরদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ১৯০২ সালের মার্চ্চ মাসে আমি কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'জীবনে কখনও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব না'। আমার চাকুরী ছাড়িবার পর ডেট্রয় মোটর কোম্পানী পাততাড়ি গুটাইল এবং বিখ্যাত লেল্যাণ্ডস্ কোম্পানী উহা কিনিয়া লইলেন।

মোটর কোম্পানীর চাকুরী হইতে বাহির হইয়া ৮১ নং পার্ক প্লেসে একটা একতলা বাড়ী ভাড়া লইলাম। উদ্দেশ্য ছিল গ্যাস ইঞ্জিনের আরও পরীক্ষা করা, তারপর নূতন প্রণালীতে ব্যবসায়ে হাত দেওয়া। ১৯০২ সালে ফোর্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা না করা পর্য্যন্ত শুধু মোটর ইঞ্জিনের উন্নতির জন্য নানারূপ গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়াই কাটাইয়াছি। যখন কারখানার কাজ না থাকিত তখন সহরে ব্যবসার বাজারে নানা অলি-গলি ঘুরিয়া বাজারের আসল অবস্থাটাকে হজম করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমার প্রথম গাড়ী লইয়া এপর্য্যন্ত প্রায় চব্বিশ পঁচিশ খানা গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে কুড়ি খানা বিক্রি হইয়া গিয়াছিল। তখন মোটর শিল্পের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়াছে এবং

দ্বিতীয় পর্ব্বে সুরু হইয়াছে বেগ ও গতির অধ্যায়। এজন্য বাধ্য হইয়া আমাকেও এদিকে নজর দিতে হইয়াছিল। ক্লিভল্যাণ্ডের উইণ্টন গাড়ী ছিল তখন মোটর জগতে গতির রাজা। উহার দেখাদেখি আমিও নূতন করিয়া একখানা গাড়ী তৈয়ারী করিলাম এবং দুই গাড়ীর মধ্যে চলিল পাল্লা। ডেট্রয়েরে গ্রস পয়েণ্টের পথে আমাদের প্রতিযোগিতা চলিল। আমি জিতিলাম। ইহার ফলে আমার গাড়ীর নাম চারিদিকে আরও ছড়াইয়া পড়িল। দ্রুত চলা ছাড়া মোটরের আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া লোকে তখন স্বীকার করিত না।

এখানে সে-কালের ব্যবসা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া রাখি। ব্যবসায়ের নীতি যাহা হওয়া উচিত সে-যুগের প্রচলিত নিয়মকে আমার কাছে ঠিক তাহার উল্টা বলিয়া মনে হইত। সকলেরই লক্ষ্য ছিল শুধু টাকার দিকে। তৈয়ারী জিনিষে ক্রেতা সন্তুষ্ট হইবে কিনা এবং জিনিষটাকে সাধারণের নিকট কতটা প্রয়োজনীয় করা তোলা যায়, এই সকল বিষয়ের দিকে কেহই মনোযোগ দিত না। ব্যবসায়ীর জিনিষ যে-কোন প্রকারে বিক্রয় হইলেই হইল। ক্রেতার প্রতি বিক্রেতার যে একটা কর্ত্তব্য আছে, ক্রেতা অসন্তুষ্ট হইলে যে সেই কর্ত্তব্যের বিচ্যুতি ঘটিল এই কথা তখন ব্যবসায়ীরা ভাবিতেই পারিত না। জিনিষ বিক্রয় হইয়া গেলে তাহা থাকুক কি যাউক, ক্রেতা মরুক কি বাঁচুক তাহা দেখা কোন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিত না। মোটর ব্যবসায়ীদের ছিল আরও সুবিধা, কারণ গাড়ীর কোন অংশ খারাপ হইয়া গেলে তাহার জন্য ইচ্ছামত বেশী দাম আদায় করা যাইত। এই নীতিকে অবলম্বন করিয়া তখন বহু

কোম্পানি গড়িয়া উঠিতেছিল। ক্রেতা জিনিস কিনিয়া সন্তুষ্ট হইলে ব্যবসায়ে লাভ আপনি হইবে এবং ব্যবসাকে লাভবান করিবার জন্য ও কাজে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য যে প্রথম ছোট করিয়াই কারবার আরম্ভ করা উচিত তখন বাজারে ইহা কাঁচা ব্যবসায়িদের অপরিপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া গণ্য হইত। সেই ছিল তত বড় ব্যবসায়ী যে যত বড় কোম্পানী ফাঁদিয়া চারিদিকে সোরগোলের সৃষ্টি করিয়া লাভের খাতায় বড় বড় অাঁক বসাইতে পারিত।

সাধারণতঃ দেখিয়াছি ব্যবসায়ীরা কারবার করিতে যাইয়া মূলধনের উপর চল্‌তি হিসাবে একটা সুদ ধরিয়া লয়। ফলে পণ্যের দাম অনেকটা বাড়িয়া যায়। এই বাড়্‌তি দাম আদায় করা হয় পরোক্ষে ক্রেতাদের নিকট হইতে। মূলধনের উপর সুদ ধরিয়া লইবার তাৎপর্য্য আজ পর্য্যন্ত আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যবসায়ে শুধু টাকা হিসাবে টাকার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারখানা চালাইতে হইলে যে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, আসবাব-পত্র কিনিতে হয় তাহার জন্যই টাকার প্রয়োজন। ব্যবসায়ের মূলধনও সেইরূপ পণ্যোৎপাদনে যন্ত্রবিশেষ ছাড়া কিছুই নয়। বাজারে পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত টাকার উপর লাভের দাবী করা অন্যায়।

ব্যবসায়ের আর একটা নিয়ম দেখিয়াছি, ঘাট্‌তি কারবারে নূতন করিয়া টাকা ঢালা। কারবার ভাল চলিতেছে না, তখনই ঝোঁক চাপে আরও টাকা ঢাল। ঘাট্‌তির ব্যবসায়ে নূতন করিয়া অর্থব্যয় করিবার মত ভুল আর নাই। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যেখানে কারবার পরিচালনার সুবন্দোবস্ত নাই, সেখানেই নূতন করিয়া টাকা ঢালিবার প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ যে কোম্পানীটা দুইদিন আগে দরজা

বন্ধ করিত নূতন করিয়া টাকা ঢালিবার অর্থ সেই মৃতকল্প কোম্পানীকে আরও কয়েকদিন কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখা। ইহাতে তো মূলধন ভালরূপে খাটেই না, অধিকন্তু টাকা নষ্ট হয়।

এই তো গেল সেই সময়ের ব্যবসায়ের প্রচলিত পদ্ধতি। এই সব দেখিয়া শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কাজের পূর্ব্বেই যেখানে টাকার হিসাব হয়, অথবা কোন মূলধনওয়ালা যে ব্যবসায়ের অংশীদার সেই ব্যবসায়ে কখনও যোগ দিব না। আরও সঙ্কল্প ছিল, যে কারবারে দশজনের উপকার হইবে না এবং আমার মতানুসারে যে কারবার চালাইতে পারিব না তাহাতে কখনও হাত দিব না। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, কোন মহৎ উদ্দেশ্য না লইয়া শুধু টাকার জন্য ব্যবসা করা কোন উদ্যমশীল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উচিত নয়। শিল্প-ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত সাধারণের সেবা। হাতে-কলমে কাজ করিয়া ইহা সকলকে দেখানই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য। পণ্য বিক্রয় হইয়া গেলেই ব্যবসার কাজ শেষ হইল না। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ব্যবসায়ীর ব্যবসার সূত্রপাত মাত্র। মোটর ব্যবসায়ীর পক্ষেও একই কথা খাটে। মোটব যদি ভাল না চলে, ইঞ্জিন যদি অল্প সময়ের মধ্যে খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে কারখানার মালিকের মোটর তৈয়ারী না করাই ভাল। বাজারে খারাপ গাড়ী চালাইবার অর্থ বদনাম লওয়া; কিন্তু মোটর ব্যবসায়ের প্রথম যুগে নিয়ম ছিল ঠিক বিপরীত। মোটরের ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের প্রচলিত পদ্ধতির দূষিত হাওয়াকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। তাহারা মনে করিত গাড়ী বিক্রয় হইলেই হইল, বিক্রয়ের পর উহা চলুক বা না-চলুক তাহার দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই সকল ত্রুটির সুযোগ লইয়া আমরা ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় করিয়াছিলাম। আমাদের গাড়ীর কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জামাদি যেমন সুন্দর ও মজবুত ছিল গাড়ীর মূল্যও তেমন সস্তা করিয়া ছিলাম। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী আপনা হইতেই অন্যান্য গাড়ী অপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইত। আমরা শুধু গাড়ী সস্তা ও ভাল করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। আমি মনে করিতাম, যাহারা আমাদের গাড়ী ক্রয় করিবে খারাপ হইলে তাহাদের গাড়ী যথাসম্ভব সত্বর ও সস্তায় মেরামত করিয়া দেওয়া আমাদেরই কর্ত্তব্য। ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী মেরামতের কারখানাগুলি তখন মোটর ব্যবহারকারিদের আরও সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। অন্য কোন কোম্পানীতে এই সুবিধা ছিল না। উহাদের গাড়ী খারাপ হইলে মেরামতের জন্য বহু বেগ পাইতে ও বহু অর্থব্যয় করিতে হইত। সামান্য মেরামতির জন্য মিস্ত্রীরা অসম্ভব রকমের দর হাঁকিত। ১৯১০-১১ সাল পর্য্যন্ত এইভাবেই মোটর ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছিল। আমরাই প্রথম এই কু-পদ্ধতি দূর করি। একদিনের দু'পয়সা লাভের জন্য স্থায়ীলাভ চিরতরে নষ্ট করা আমি কখনও যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করি নাই।

সে সময়কার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর একটা ধারা লক্ষ্য করিয়াছি। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল কিছু টাকা পয়সা সঞ্চয় করিয়া বাকী জীবনটাকে নির্ব্বিঘ্নে, নির্ভাবনায় কাটাইয়া দেওয়া। ইহা যাহারা না পারিত তাহারা নিজেদের ভাগ্যকে দুষিত। জীবনটা ছিল তাহাদের নিকট একটা একটানা সংগ্রাম এবং যত শীঘ্র সেই সংগ্রাম শেষ করা যায় ততই ভাল। জীবন সম্বন্ধে এই ভাবের অর্থ আমি কিছুতেই বুঝিয়া

উঠিতে পারি নাই। জীবন যদি সংগ্রামই হইয়া থাকে তাহা হইলে নির্ভাবনায় জীবন কাটাইবার যে অলস আকাঙ্ক্ষা তাহারই সহিত সংগ্রাম। কর্ম্মহীন জীবনের সুখ-স্বপ্ন অলস ব্যক্তিদের পক্ষেই শোভা পায়। জীবন গতিশীল—লক্ষ্যে পৌছিবার একটা দীর্ঘ পথ মাত্র। এই সুদীর্ঘ যাত্রা-পথে থামিয়া দাঁড়াইলে পেছনে পড়িয়া যাওয়া সুনিশ্চিত। লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে প্রাণবন্ত, গতিশীল, কর্ম্ম-তৎপর।

'জীবন একটা সংগ্রাম', এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে কর্ম্মোন্মুখ জীবনকে এমন আঁট-ঘাটে বাঁধিয়া রাখে যে, তাহাদের কর্ম্মধারার গতি যে-ভাবে চলিতেছে তাহার একচুল এধার-ওধার হইবার উপায় নাই। নিয়ম-কানুনের কঠোর বাঁধনে জীবনকে তাহারা করিয়া তোলে যন্ত্রবিশেষ। অভ্যাসগত কার্য্যের প্রণালী তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না এবং ত্যাগ করিবার ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছাও তাহাদের নাই। আজীবন একই প্রথায় কাজ করিবার অভ্যাসকে আমি অলসতার রূপান্তর বলিয়াই মনে করি ; ইহাকেই বলে অভ্যাস-দোষ। প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই তাহারা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মুচি যে ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে সে তাহা পরিবর্ত্তন করিবে না, শিল্পী পণ্য প্রস্তুতের অনুসৃত নিয়ম পরিবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ। আমার নিজের কারখানায়ও তাহাই দেখিয়াছি। যখনই কোন কার্য্য পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছি তখনই শ্রমিকগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের ভয় হইত বুঝি বা কোম্পানী তাহাদের আরও বেশী করিয়া খাটাইতে চেষ্টা করিতেছে।

হেনরী ফোড

জীবন ধারায় পরিবর্ত্তনের প্রকৃত অর্থ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কালের চক্র তাহাদের অতিক্রম করিয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে এবং যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন রাখিয়া গিয়াছে। এজন্যই কাল পরিবর্ত্তনশীল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে রাত্রির ঘুম হইতে উঠিবার পরও যদি কেহ মনে করিয়া থাকে তাহার পূর্ব্ব কর্ম্ম-প্রণালী যথাযথ রহিয়াছে, অথবা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত তাহার চিন্তাশক্তির একটা ধারা তখনও ঘুমে অচৈতন্য রহিয়াছে কিনা। 'জীবনে কায়েম হইয়া বসিয়াছি' এইরূপ ধারণা করিবার সম্মুখের পথে সমূহ বিপদ রহিয়াছে। কায়েম হইয়া বসিবার অর্থ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। উন্নতির সতত গতিশীল রথচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে স্থানুজীবনের মুমূর্ষু স্পন্দন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবেই।

পাঁচজনে কি বলিবে, অনেকে আবার এই ভয়েও নূতন কিছু করিতে ভয় পায়। এখানে মনে হয়, জনমত যেন পাহারাওয়ালা পুলিশ; অবশ্য জনমতের ভয় যে সকল সময়েই খারাপ তাহা বলিতেছি না। সৎকার্য্যের জন্য পাঁচজনের কথা শুনিতে হইলেও আমি ভাল মনে করি। অনেক সময়ই দেখা যায় পাঁচজনে যাহাকে 'বোকা' বলে সেই বোকাই ভবিষ্যতে সংসারের বন্ধুর পথে চলিতে সক্ষম হয় ধীর স্থির ভাবে। সেই বোকাদের কার্য্যের সমীচীনতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিয়ম-পন্থা বাঁচিয়া থাকে জগতে বহুকাল।

ব্যবসায়ের বাজারে দেখিয়াছি যত গোলমালের মূলে টাকার লোভ। বেশীলাভ করিতে গেলে ব্যবসায়ে গোলমাল ঘটে এবং

শ্রমিকেরা ন্যায্য বেতন হইতে বঞ্চিত হয়। ঘরে সুব্যবস্থার অভাব হইলে শ্রমিকেরা বেতন পাইবেই বা কোথা হইতে? লক্ষ্য রহিল টাকার দিকে, হাতে কাজ করিয়া গেলাম, ইহাতে কাজ ভাল হওয়া কঠিন। দুইটি কাজ সমানভাবে এক সঙ্গে করা সম্ভবপর নয়। কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়াই সফলতা লাভের একমাত্র উপায়। প্রথম দিকে আমি এজন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিয়াছি। তখন টাকার জন্য আমাকে কাজ করিতে হইত, কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতাম না। কাজ হইতেই লাভ হইবে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াও কেন যে শুধু লাভের উপরই লোকে নজর রাখিত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না।

এই প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতা বা কমপিটিশন সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া রাখি। সে সময় সম-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার হিড়িক লাগিয়াই ছিল। কি করিয়া সম-ব্যবসায়ীকে পেছনে ফেলিয়া রাখা যায়, ইহা ছিল সকলের উদ্দেশ্য। যেন বাজারের ক্রেতা সব ফুরাইয়া গেল। প্রতিযোগিরা ক্রেতার সংখ্যাকে এইরূপ কম করিয়াই দেখিত। বাজার হাতে রাখিবার জন্য দেখিয়াছি মোটর ব্যবসায়ীরা একটা সমিতি বা এসোসিয়েশন গড়িয়াছিল। প্রতিযোগিতাকে আমার কিন্তু অতি আদিম নীতি বলিয়া মনে হইত। প্রতিযোগিতার ফন্দি আঁটিতে যে সময় যায় তাহাকে সময়ের অপব্যবহার বলা চলে। সেই সময়টুকু বরং কাজে লাগান ভাল। লোকের পছন্দ মত জিনিষ যদি অনুরূপ মূল্যে দেওয়া যায় তাহা হইলে কখনও ক্রেতার অভাব ঘটিতে পারে না। ব্যক্তিগত কাজ ও ব্যবসায়ের কাজ দুইয়ের পক্ষেই এই কথা খাটে। অন্ততঃ আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস।

তখন আমি তিনখানা মোটর তৈয়ারীর কাজে হাত দিয়াছিলাম। দিবারাত্রি কাজ করিতাম, কাজ সম্বন্ধে ভাবিতাম। কাজের লোকে কখনও কাজ ছাড়িতে পারে না, ছাড়া উচিতও নয়। স্বপ্নেও তাহাদের ভাবিতে হইবে কাজের কথা। কর্ম্মে যাহার অসীম প্রেরণা জীবনে সফলতা তাহার অবশ্যম্ভাবী।

এই বৎসর দেখিয়া শুনিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা শিখিয়াছি এবং ক্রমে আরও শিখিতেছি, কিন্তু মূল নীতির আমার কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—

(১) কাজ অপেক্ষা টাকাকে বড় করিয়া দেখা হয় বলিয়া ব্যবসা নষ্ট হয় এবং ব্যবসায়ে যে দশজনের উপকার করা যায় সেই ভাব চলিয়া যায়।

(২) টাকার কথা বেশী ভাবিলেই সঙ্গে সঙ্গে আসে ব্যবসায়ে 'ফেল' পড়িবার ভয়। ইহাতে ভবিষ্যতের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন কাজে আত্মনিয়োগ করিবার মত সাহস থাকে না।

(৩) সাধারণের উপকারের কথা ভাবিয়া যাহারা কাজে হাত দেয় তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সাফল্যের গৌরব মুকুট তাহাদের প্রায় করতলগত। প্রকৃত কর্ম্মীর কার্য্যে বিফলতা স্থান পায় না।

—তিন-

৮৯১ নং পার্ক প্লেসের ছোট কারখানায় নূতন গাড়ী লইয়া কাজ করিবার পক্ষে আমার খুব সুবিধা ছিল। এখানে হাতে-কলমে কাজ করিয়া দেখিলাম, আমার মতানুযায়ী কোম্পানী যদি বা গড়িয়া তুলিতে পারি সেখানে পরিকল্পিত প্রণালীতে কাজের মোটেই সুবিধা হইবে না। যথা সম্ভব সস্তাদরে বাজারে মোটর বিক্রয় করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম পুরাতন মামুলি যন্ত্রপাতি লইয়া সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মে কাজ করিলে সস্তা দরে মোটর তৈয়ারী করিতে পারিব না।

পুনঃ পুনঃ একটা কাজ করিলে কাজের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে, কাজের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় কি উপায় অবলম্বন করিলে কাজটা আরও সহজ হয়। কর্ম্মী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারে। এজন্য প্রয়োজন হয় শুধু সামান্য গবেষণা ও মস্তিষ্ক চালনার। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারটা বুঝিয়াও বুঝে না। পূর্ব্ব-পুরুষদের সেই জীর্ণ পুরাতন প্রথা যেন তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বাজারে চাহিদা নাই, অতএব জিনিষ তৈয়ারী করিব না। কিন্তু চাহিদার গোড়া কোথায় তাহা একবার কেহ ভাবিয়া দেখে না। বাজারে ক্রেতা রহিয়াছে

যথেষ্ট কিন্তু কিনিবার জিনিষ নাই, শতকরা ৯৫ জন চায় সস্তাদরে পছন্দমত জিনিষ। যাহারা ক্রেতাদের এই চাহিদা মিটাইতে পারে বাজারে এক চেটিয়া দখল কায়েম করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর। ইহার সহিত প্রতিযোগিতার কোন সম্পর্ক নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িল। ইহাকে "বিশেষী-করণ" (Specialisation) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। "বিশেষীকরণ" অর্থে আমি বুঝি, একজন শুধু একটা কাজের দিকেই আত্মনিয়োগ করিবে এবং একমাত্র সেই কাজের উন্নতি সাধন ও পূর্ণতার জন্য মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবে। সকল কাজের পক্ষেই এই কথা খাটে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন কারণ নাই। কোন কারখানায় শুধু একটা নির্দ্দিষ্ট জিনিষ তৈয়ারী করিতে সাধারণতঃ ব্যয় পড়ে খুব কম এবং তদনুপাতে লাভ হয় বেশী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই প্রণালীতে পণ্য উৎপাদন করিয়াও ব্যবসায়ীরা বাজারে জিনিষ যথাসম্ভব উচ্চদরে বিক্রয় করে। ক্রেতা কি চায় না-চায় সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাহাদের মোটেই নাই। এই সকল ব্যবসায়ের দোষ এই যে, যতদিন বাজারে উঁচুদরে জিনিষ কিনিবার মত ক্রেতা মিলে ততদিন কারবার বেশ চলে, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া গেলেই উহার মৃত্যু। তখন কারখানায় জিনিষ মজুত হইতে থাকে কিন্তু বাজারে আর বিক্রয় হয় না। জিনিষের মূল্য কম থাকিলে সেই জিনিষগুলি হয়তো বিক্রয় হইয়া যাইত। এই অবস্থায় জিনিষের মূল্য যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়াই ব্যবসায় বুদ্ধির বিচক্ষণতার লক্ষণ। কিন্তু এখানেও বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সহসা পণ্যের মূল্য কমাইলে ক্রেতারা অনেক সময় সস্তার উপরও

আস্থা হারাইয়া ফেলে। আমি নিজে এই দুর্ভোগ একবার ভুগিয়াছি। সকল ব্যবসায়েরই মূল নীতি থাকা উচিত পণ্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহাতে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। সকল ব্যবসা যে কেন এই নীতিতে চালানো হয় না মাঝে মাঝে তাই ভাবি। টাকা লইয়া কামড়া-কামড়ির ব্যাপারটা ছাড়িতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। এই নীতিতে ব্যবসা চালাইলে সমাজের ও দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর হয়। ইঞ্জিন লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় সর্ব্বদা আমার এই কথাগুলি মনে হইত। অনেক সময় বসিয়া বসিয়া এই বিষয় ভাবিয়াছি।

এবার আমার নিজের কথা বলা যাক্। তখন সকলেরই ধারণা ছিল ভাল গাড়ী হইলে উহার গতিও খুব দ্রুত হইবে। এজন্য আমিও দুইখানি 'রেসিং' গাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু 'রেসিং' গাড়ীর উপকারীতা যে কি তাহা কিছুতেই উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি নাই। অবশ্য 'রেসিং' গাড়ী তৈয়ারী করিবার পরই ফোর্ড গাড়ীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এ বিষয়ে রেসের গাড়ীতে আমার যথেষ্ট উপকারই হইয়াছিল বলিতে হইবে।

১৯০৩ সালে আমার রেসের গাড়ী দুইখানা তৈয়ারী শেষ হয়। একখানা গাড়ীর নাম দিয়াছিলাম "এ্যারো", অপরখানার "৯৯৯"। দু'খানা গাড়ীর ইঞ্জিনই ছিল আশী অশ্বশক্তিসম্পন্ন। মোটর গাড়ীতে এত শক্তিশালী ইঞ্জিন বসাইবার কল্পনা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। ইঞ্জিন তো দেওয়া হইল কিন্তু গাড়ী চালাইবে কে? আমার সহকর্ম্মী মিঃ কুপার বলিলেন, সল্টলেক সিটিতে তাঁহার জানাশোনা

একজন লোক আছে, সে নাকি সর্ব্বদাই এজন্য প্রস্তুত। প্রাণের মায়া তাহার নাই, মৃত্যুভয় সে করে না। তাহাকে তখনই টেলিগ্রাম করা হইল। এই লোকটির নাম ছিল বার্ণি ওল্ডফিল্ড। কিন্তু ওল্ডফিল্ড মোটর চালাইতে জানিত না, অথচ গতি পরীক্ষায় তাহার অসীম উৎসাহ। দেখিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যেই সে মোটর গাড়ী চালান শিখিয়া ফেলিল। ঠিক হইল গ্রস পয়েণ্টের পথে তিন মাইল চালাইয়া আমার গাড়ীর চলনশক্তি পরীক্ষা করা হইবে। এক্ষণে মোটর চালাইবার যত সুবিধা আছে সে সময় তাহার কিছুই ছিল না—এমন কি গাড়ীর মোড় ঘুরাইবার এবং সহসা গাড়ী থামাইয়া দিবার কলকব্জা পর্য্যন্ত গাড়ীতে ছিল না। এত অসুবিধা সত্ত্বেও ওল্ডফিল্ড 'রেস' দিতে রাজী হইল এবং প্রতিযোগীকে আধা মাইল পেছনে রাখিয়া বাজী জিতিয়া গেল।

গ্রস পয়েণ্টে প্রতিযোগিতার এক সপ্তাহ পরে ১৯০৩ সালে আমি ফোর্ড মোটর কোম্পানীর গোড়াপত্তন করি। আমিই ছিলাম তখন কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেনারেল ম্যানেজার, নক্সাকারী এবং মিস্ত্রি—অর্থাৎ একাধারে সব। এক লক্ষ ডলার প্রস্তাবিত মূলধন লইয়া কোম্পানী আরম্ভ করা হয়। উহাতে আমার ছিল শতকরা প্রায় ২৫॥ অংশ। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর আদায় মূলধন ২৮ হাজার ডলারের অধিক ছিল না। মূলধন বাড়াইবার জন্য অংশীদারদের নিকট হইতে অতঃপর আর টাকা আদায় করা হয় নাই। অতিরিক্ত যে টাকা নিয়াছি তাহা গিয়াছে কারবারের লাভ হইতে। মনে করিয়াছিলাম কোম্পানীতে আমার অপেক্ষাকৃত বেশী অংশ না থাকিলেও ব্যবসা চালাইতে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে

না, কাজ আমার কথামতই চলিবে। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যেই আমার ভুল ভাঙ্গিল। দেখিলাম ইচ্ছা মত কাজ চালাইতে হইলে আমার এমন অংশ থাকা চাই যাহাতে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করা চলে। এজন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহা দিয়া ১৯০৬ সালে কোম্পানীর শতকরা ৫১টী অংশ কিনিয়া ফেলিলাম। পরে আরও কিছু শেয়ার কিনিয়া কোম্পানীতে আমার অংশ করিয়াছিলাম শতকরা ৫৮॥ ভাগ।

১৯১৯ সালে ব্যবসার প্রণালী লইয়া কোম্পানীর অন্যান্য অংশীদারদের সহিত আমার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহারা রাগ করিয়া তাহাদের অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে চাহে। আমার পুত্র এডসেল কোম্পানীর বাকী অংশ কিনিয়া লয়। এজন্য তাহাকে প্রতি একশত ডলার মূল্যের শেয়ারের জন্য দিতে হইয়াছিল সাড়ে বার হাজার ডলার। কোম্পানীর বাকী ৪১॥ ভাগ ক্রয় করিতে এডসেলের লাগিয়াছিল সাড়ে সাত কোটি ডলার।

১৯০৩ সালে আমরা যে কোম্পানী করি তাহার যন্ত্রপাতি খুব বেশী ছিল না এবং যাহা ছিল তাহাও আদৌ উঁচুদরের ছিল না। এজন্য ম্যাকে এভিনিউতে স্ট্রেলো কোম্পানীর কারখানা আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে গাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন কারখানায় অর্ডার দিয়া তৈয়ারী করাইতাম। আমাদের কারখানায় সেই অংশগুলিকে জোড়া দিয়া গাড়ী প্রস্তুত করা হইত। কোন জিনিষের গোটা অংশই যে এক জায়গায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের নিয়মও হইবে কোন জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে তৈয়ারী করা। একটা কারখানায় যদি শুধু

বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখিলেই এ সম্বন্ধে উপলব্ধি হইবে। আমরা লিখিয়াছিলাম—

"সময়ের অভাব বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করেন, যাঁহাদের প্রত্যেক পাঁচ মিনিটের মূল্য এক ডলার, সামান্য সময়ের এদিক-ওদিকে যাঁহাদের বহু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা কি এখনও সেই আদিম যুগের ঘোড়ায় টানা গাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকিবেন? অথচ অতি কম মূল্যের ফোর্ড গাড়ী কিনিলে "পাছে দেরী হয়" এই অস্বস্তি আর তাঁহাদের ভোগ করিতে হইবে না। ফোর্ড কাজ ও আরাম উপভোগ উভয়ের জন্য তৈয়ারী। ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

এই সময়ও আমাদের ইচ্ছামত সরঞ্জামে গাড়ী তৈয়ারী করিতে পারি নাই। বাজারে যে রকম জিনিষ পাওয়া যাইত তাহাতেই কাজ চালাইতে হইত। নিজেরা যে প্রয়োজন মত জিনিষ তৈয়ারী করিব এইরূপ অর্থও হাতে ছিল না। তখন আমি আবার সকল দেশে, সকল স্থানে চালাইবার জন্য নূতন মডেলের গাড়ী প্রস্তুতের পরিকল্পনায় ছিলাম। ইচ্ছা ছিল কারখানায় শুধু সেই মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিব।

কিন্তু মাত্র একটা মডেলের গাড়ী দ্বারা ব্যবসা চলিতে পারে, আমার সহযোগীদের কিছুতেই এই কথা বুঝাইয়া উঠিতে পারিলাম না। সে-সময় মোটর ও সাইকেল ব্যবসায়ীদের নিময় ছিল নিত্য নূতন ফ্যাসানের গাড়ী তৈয়ারী করা। অবস্থা ছিল অনেকটা মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের ফ্যাসানের মত। নূতন ফ্যাসানের আমদানী হইলেই পুরাণোটা বাতিল হইয়া গেল। এ যেন ক্রেতাদের ক্রমাগত ঠকাইবার একটা ফন্দী। কিন্তু আমার মতলব ছিল অন্য

রকমের ; আমার গাড়ী একবার যাহার কাছে বিক্রয় করিব তাহার যেন আর কখনও নূতন গাড়ী কিনিতে না হয়। গাড়ীর ফ্যাসান পরিবর্ত্তন করিলে এমন ভাবে করিব যেন পুরাতন গাড়ীতেও সেই পরিবর্ত্তিত অংশ লাগান যায় অর্থাৎ ফোর্ড গাড়ী একবার যে কিনিবে উহা তাহার চিরদিন নূতন থাকিবে। কিন্তু আমার এই মতলব কাজে লাগাইতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল।

কোম্পানীর দ্বিতীয় বর্ষে আমরা তিন রকম মডেলের গাড়ী তৈয়ারীর জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। চার সিলিণ্ডারের "বি" মডেলের গাড়ী—দাম দুই হাজার ডলার ; "এ" মডেলের গাড়ী অপেক্ষা একটু ভাল "সি" মডেল—দাম নয়শত ডলার, এবং "এফ" মডেলের গাড়ী—দাম এক হাজার ডলার। এই তিন ফ্যাসানের গাড়ী তৈয়ারী করিতে আমাদের মন দিতে হইয়াছিল নানাদিকে এবং গাড়ীর দামও কিছু বাড়াইয়াছিলাম। এজন্য প্রথম বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর আমাদের গাড়ী বিক্রয় হইল অনেক কম। মোট বিক্রয় করিয়াছিলাম ১৬৯৫ খানা।

"বি" মডেলের গাড়ীগুলি ছিল সাধারণ ব্যবহার ও রাস্তায় চলাচলের জন্য। ইহার জন্য বাজারে বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছিল। 'রেসে' জয়লাভ করাই ছিল তখন বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। ১৯০৩ সালে '৯৯৯' নম্বরের গাড়ীর সঙ্গে ৮০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন দিয়া "এ্যারো" নামে যে গাড়ীখানা তৈয়ারী করিয়াছিলাম উহাকেই অদল-বদল করিয়া ঠিক করিয়া লইলাম। নিউইয়র্কে মোটর প্রদর্শনীর পূর্ব্ব সপ্তাহে বরফের উপর আমাদের গাড়ীর বেগ পরীক্ষা করা হইল। আমি নিজে গাড়ী চালাইলাম।

আমার জয় হইল। "বি" মডেলের গাড়ীর নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

আমাদের কাজ যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল তাহাতে আমাদের ছোট কাঠের ঘরের কারখানায় স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। এজন্য ১৯০৬ সালে পিকোয়েট ও বোবিন ষ্ট্রীটের কোণে একটা তিনতলা কারখানা তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেলাম। এখানে আমরা নিজেরাই কতক কতক জিনিষ তৈয়ারী করিতাম, কিন্তু বেশীর ভাগ জিনিষই কিনিতে হইত অন্য জায়গা হইতে। ১৯০৫-৬ সালে আমরা মাত্র দুই রকম মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। ইহাদের এক মডেলের দাম ছিল দুই হাজার ডলার, আর এক মডেলের এক হাজার ডলার। কিন্তু আমাদের বিক্রি কমিয়া গেল। এবার বিক্রয় করিলাম মাত্র ১৫৯৯ খানা গাড়ী।

তখন সকলেই বলিতে লাগিল, নূতন মডেলের গাড়ী করিতেছি না বলিয়া আমাদের বিক্রি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইল অন্যরূপ। ভাবিলাম সাধারণের পক্ষে আমার গাড়ীর দাম নিশ্চয় খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এই ভাবিয়া ব্যবসায়ের নীতি বদলাইয়া ফেলিলাম। ১৯০৬-৭ সালে কারখানায় শুধু এক মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিতে লাগিলাম। সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ফ্যাসানটা অন্য ধরণের করা হইল। এদিকে গাড়ীর দামও কমাইয়া দিলাম। একটু ভাল গাড়ীর দাম করা হইল ৭০০ ডলার এবং পরের মডেলের দাম ৬৫০ ডলার। এবার আমাদের গাড়ী বিক্রয় হইল ৮৪২৩ খানা। প্রথম বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর পাঁচগুণ অধিক গাড়ী বিক্রয় করিলাম। ১৯০৮ সালের ৫ই মে যে সপ্তাহ শেষ হয়

সেই সপ্তাহটা আমাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উক্ত সপ্তাহে ছয় দিনে আমরা ৩১১ খানা গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। সেই বৎসর জুন মাসে একদিন আমাদের কারখানায় তৈয়ারী হইল একশত গাড়ী। ইহার পরের বৎসর নূতন রকমের দামী গাড়ীতে হাত দিতে গিয়া বিক্রি কতকটা কমিল। এক দিকে আত্মনিয়োগ করিতে না পারায় গাড়ী বিক্রি হইল মাত্র ৬৩৯৮ খানা।

কোম্পানী আরম্ভ করিবার পর হইতে প্রথম পাঁচ বৎসর আমাদের কাটিয়াছে নানাপ্রকার পরীক্ষার ভিতর। বিভিন্ন মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিয়া ব্যবসায়ের গতি ও বাজারের চাহিদা পরীক্ষা করিয়াছি। আমাদের গাড়ী ইতিমধ্যে ইউরোপের বাজারেও বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন মোটরের ব্যবসা ছিল খুব লাভ-জনক। আমাদের হাতে বেশ দু'পয়সা জমিয়া গিয়াছিল। নগদ মূল্যে সোজাসুজি ক্রেতার নিকট আমরা গাড়ী বিক্রয় করিতাম। ব্যবসা চালাইবার জন্য ধার করা ছিল আমাদের নীতির বাহিরে। সর্ব্বদা আয় বুঝিয়া ব্যয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল। ব্যবসায়ের এই নীতি লইয়া আমাদের কখনও মাথা ঘামাইতে হয় নাই; কারণ দেখিয়াছি, কাজ ও সাধারণের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিলে অর্থের অভাব কখনও হয় না।

ফোর্ড গাড়ীর বিক্রেতা নিযুক্ত করিতে আমাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সে-সময় মোটর ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ আস্থা ছিল না। সকলেই মনে করিত বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা দু'দিনের অধিক টিকিয়া থাকিবে না। এজন্য আমরা বিক্রেতা হিসাবে নিযুক্ত করিতাম মোটর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

ব্যক্তিদের খুব মোটা বেতনে। তাহাদের কাজের উপর আমাদের খুব কড়া নজর থাকিত এবং আফিসের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের চলিতে হইত। বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের আদেশ ছিল তাহারা স্ব স্ব জেলায় মোটর ক্রয়ে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়ী যাইয়া ফোর্ড গাড়ীর উপকারীতা সম্বন্ধে তাহাদের বুঝাইবে। কোন স্থানে যাওয়া সম্ভবপর না হইলে অন্ততঃ চিঠিপত্র লিখিয়া তাহাদের এবিষয় বুঝাইতে হইবে।

এখানেই বাধিয়া উঠিল যত গোলমাল। সেলডেন পেটেণ্ট মোটর এসোসিয়েশন আমাদের নামে মামলা রুজু করিয়া বসিল। এই মামলায় আমাদের বহু অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছিল। সেলডেন কোম্পানীর অভিযোগ ছিল যে, ১৮৭৯ সালে তাহারা যে মোটর পেটেণ্ট রেজিষ্টারী করিয়া রাখিয়াছিল আমরা তাহাই নকল করিয়া বাজারে চালাইতেছি। অথচ নকল করা তো দূরের কথা, তখন মোটর সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণাই ছিল না। সেলডেন কোম্পানীর পেটেণ্ট রেজিষ্টারীর খবরও কেহ রাখিত কিনা সন্দেহ। আমরা এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখিতাম না। ১৯০৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর জজ মামলার রায় দিলেন। আমরা হারিয়া গেলাম।

মামলায় জিতিয়া সেলডেন কোম্পানী কোমর বাঁধিয়া আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে লাগিয়া গেল। তাহারা এ পর্য্যন্ত বলিতেও ছাড়িল না যে, ফোর্ড গাড়ীর ক্রেতাদের গ্রেপ্তার করা হইবে; অতএব ফোর্ড গাড়ী ক্রয় করা আর জেলের টিকিট কেনা একই কথা। এই বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে প্রথম দিকে আমাদের অবশ্য কতকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আখেরে জয় হইবে আমাদেরই। সেলডেন কোম্পানীর প্রচারের

জবাব স্বরূপ আমরা প্রত্যেক সংবাদপত্রে চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপনে ক্রেতাদের বিশেষ ভাবে জানাইয়া দিলাম, ফোর্ড গাড়ী কিনিলে ভয়ের কোন কারণই নাই; আর যদি বা কোন বিপদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ফোর্ড কোম্পানী ক্রেতাকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত। প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে জামিন মুচলেকা দিতেও সম্মত হইলাম। এত প্রচারের বিরুদ্ধেও এই বৎসর আমাদের গাড়ী বিক্রয় হইল আঠারো হাজারেরও অধিক। সামান্য কয়েকজন ব্যতীত জামিন মুচলেকাও কেহ চাহে নাই। এই মামলার ফলে ফোর্ড কোম্পানীর নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ফোর্ডকে সকলেই সহানুভূতির চোখে দেখিতে লাগিল। ১৯০৮ সাল হইতে আমার সঙ্কল্পিত নূতন গাড়ী তৈয়ারীতে হাত দিলাম।

-চার—

কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া আমি ফোর্ড কোম্পানীর ইতিকথা বলিতেছি না, কিংবা কাহাকেও বলি না "তোমরা এই প্রণালীতে কাজ কর"। আমি সকলকে দেখাইতে চাই যে, সাধারণ চলতি প্রথায় ব্যবসা চালান বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত প্রথা নহে। যে দিন হইতে আমি ব্যবসায়ের মামুলি নিয়ম ছাড়িয়াছি সেদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে আমার সাফল্য।

ব্যবসা করিতে হইলে যাহা করা প্রয়োজন আমরা তাহাই করিয়াছি। আমাদের মোটর ছিল অতি সাধারণ রকমের। বাহিরের টাকা আমাদের কারবারে ছিল না। তাহা ছাড়া আমাদের কারবার হইত সব নগদ টাকায়। লাভের টাকা আমরা কারবারেই খাটাইতাম এবং ঘরে সর্ব্বদা যথেষ্ট নগদ টাকা রাখিতাম। যেখানে মোটর রেসের প্রতিযোগিতা হইত সেখানেই আমাদের গাড়ী থাকিত। বিক্রি বাড়াইবার জন্য আমরা বিজ্ঞাপনও দিয়াছি প্রচুর। মোটর যে বিলাসের উপকরণ বিজ্ঞাপনে তাহা আমরা কখনও প্রচার করি নাই ; অবশ্য ফরমাস পাইলে বিলাসিতার উপযোগী মোটরও আমরা তৈয়ারী করিতে পারিতাম। এই সময় আমাদের ব্যবসার যে অবস্থা ছিল তাহাতে অধিক কিছু না করিয়া অনায়াসেই চুপ্ করিয়া বসিয়া

থাকিতে পারিতাম। কারবার আপনা হইতে যেটুকু চলিতেছিল তাহাতেই আমাদের পোষাইয়া যাইত।

আমার সহকর্মী ও অংশীদারদের মধ্যে অনেকে যে এইরূপ প্রস্তাব করেন নাই, তাহা নহে। আমরা যখন দৈনিক প্রায় একশত খানা হিসাবে গাড়ী তৈয়ারী করিতে লাগিলাম তখন অংশীদারদের অনেকেই ঘাবড়াইয়া গেলেন। আমার হাতে কোম্পানীর পরিচালন ভার থাকিলে ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া এত অধিক গাড়ী তৈয়ারী করা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য তাহারা নানাভাবে আমাকে আভাস দিতে লাগিলেন। উত্তরে আমি তাহাদের জানাইয়া দিলাম, একশত গাড়ী তো অতি সাধারণ কথা, শীঘ্রই প্রতিদিন হাজার গাড়ী তৈয়ারী করা হইবে। আমার কথায় তাঁহারা হতবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি আমার বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য লইবার সঙ্কল্পও নাকি তাঁহাদের অনেকের হইয়াছিল। আজ দেখিতেছি তাঁহাদের কথা মত কাজ করিলে আমাদের ব্যবসায় তখন যেখানে ছিল এতদিন পরেও ঠিক সেখানেই থাকিত, আর আমিও একজন কৃতী ব্যবসায়ীর নাম লইয়া সুখে শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিতাম। এইরূপ শান্তিময় জীবন যাপনের প্রলোভন ত্যাগ করা খুব সহজ বলিয়া আমার মনে হয় না। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া অলস আরামের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার জন্য যাহারা অভিলাষী তাহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রহিয়াছে। তাহাদের দেখিলে আমার প্রকৃতই দুঃখ হয়।

কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার স্পৃহা আমার কখনও হয় নাই এবং কেন যে এই স্পৃহা লোকের মনে জাগে তাহাও বুঝিয়া

উঠিতে পারি নাই। কর্ম্মময় জীবনের পরিবর্ত্তে যাহারা অবসরে কাল কাটাইতে চাহে তাহাদের ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাই উচিত। আবার এমন অনেক লোকও দেখিয়াছি যাহারা কাজের গুরু দায়িত্ব ছাড়িতে চাহে কিন্তু কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে চায় ষোল আনা। এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা আমার মাথায় কখনও আসে নাই। ব্যবসার উন্নতিকে আমি অধিকতর কাজের আহ্বান, আরও কিছু করার আমন্ত্রণ বলিয়াই মনে করি। এজন্য সকল স্থানে ব্যবহারো-পযোগী নূতন মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিবার কল্পনায় ছিলাম। এসম্বন্ধে একটা প্ল্যানও ঠিক ছিল। গাড়ীর ওজন না বাড়াইয়া কি উপায়ে গাড়ীকে আরও মজবুত করা যায় এইরূপ কোন জিনিষের সন্ধানে এতদিন ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই জিনিষটা জুটাইয়া উঠিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন তাহাও জুটিয়া গেল।

১৯০৫ সালে পাম বীচে একটা মোটর রেসে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে একখানি ফরাসী গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। তখন আমি আবার "কে" (K) মডেলের গাড়ী প্রস্তুতের চেষ্টায় ছিলাম। ফরাসী মোটরের মাল-মসলা কি রকমের দেখিবার জন্য ভাঙ্গা গাড়ীর এক টুক্‌রা ইস্পাত কুড়াইয়া লইলাম। ইস্পাতটা মনে হইল খুব পাতলা অথচ শক্ত। উহা কোন শ্রেণীর ইস্পাত চিনিতে পারিলাম না। আমার সহকারীর হাতে ইস্পাতের টুক্‌রাটা দিয়া বলিলাম, "এই ইস্পাতটা কোন্ শ্রেণীর তাহা ঠিক করা চাই, আমরা এই ইস্পাতেই গাড়ী তৈয়ারী করিব।"

পরীক্ষায় দেখা গেল, ফরাসী ইস্পাতে 'ভ্যানাডিয়াম' রহিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও আমেরিকায় 'ভ্যানাডিয়াম' ইস্পাত মিলিল না।

তখন ইংলণ্ডে খোঁজ করা গেল, এ সম্বন্ধে একজন লোকও ইংলণ্ড হইতে আসিলেন। কিন্তু আসিলে কি হইবে? 'ভ্যানাডিয়াম' ইস্পাত তৈয়ারী করিতে হইলে ভিন্ন একটা কারখানা করা প্রয়োজন। পরিশেষে ইহাই হইয়া দাঁড়াইল একটা সমস্যা। ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত তৈয়ারী করিতে তিনহাজার ডিগ্রি উত্তাপ (ফারেণহিট) দরকার, অথচ সাধারণ কারখানার 'ফারনেসে' ২৭০০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপ হয় না। অগত্যা ওহিয়োর অন্তর্গত ক্যান্টনের ছোট একটা কারখানার সহিত বন্দোবস্ত করা গেল। এজন্য তাহাদের ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমাদের প্রথম চেষ্টা বিফল হইল। কিন্তু দ্বিতীয় বারে ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত বাহির হইয়া অসিল। এই ইস্পাত তৈয়ারী করিবার পর হইতে আমাদের গাড়ী আরও অনেকটা মজবুত হইয়াছে।

ভ্যানাডিয়াম হাতে পাইয়াই আমাদের গাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ খুলিয়া পরীক্ষা করিলাম কোথায় কিরূপ ইস্পাতের প্রয়োজন। ফলে আমাদের গাড়ীর জন্য কুড়ি রকমের ইস্পাত ব্যবহার করিব ঠিক করিলাম। মোটর ব্যবসায়ে ইতিপূর্ব্বে এইরূপ কেহ করিয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। গাড়ীর প্রায় দশটি জায়গায় ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত দেওয়া হইল। যেখানেই বুঝিলাম ইস্পাত পাতলা অথচ শক্ত হওয়া প্রয়োজন সেখানেই ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত দিলাম। পরে পরীক্ষা করিয়া এবং ইস্পাত বদলাইয়া আমরা গাড়ীকে আরও মজবুত ও পাতলা করিয়াছি। ১৯০০ সালে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফরাসী গাড়ীর ইস্পাতের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের ইস্পাতকেই ভাল বলিয়াছেন। ইহার পর লাগিয়া গেলাম আবার প্রস্তাবিত নূতন মডেলের গাড়ীর কাজে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাড়ী তৈয়ারী করিয়া বুঝিয়াছিলাম ইহা বিলাস-সামগ্রী নহে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই আমি সকলের ব্যবহারোপযোগী করিয়া সস্তাদরে গাড়ী প্রস্তুতের সঙ্কল্প করিলাম। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি সেই মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আসিতেছি। ক্রমে ক্রমে গাড়ীর উন্নতি সাধন এবং মূল্য আরও হ্রাস করিবার প্রতি রহিয়াছে আমার দৃষ্টি অব্যাহত। আগাগোড়া আমার লক্ষ্য ছিল, আমার গাড়ী হইবে মজবুত, দ্রুতগামী, পাতলা; ইহার কলকব্জা হইবে অতি সহজ ও সরল এবং চালাইতে ব্যয় পড়িবে খুব কম। আমার মনে হয় বর্ত্তমান গাড়ীতে আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

উপরোক্ত গুণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন গাড়ী তৈয়ারী করিতে লাগিলাম। এই নূতন গাড়ীর নাম দিলাম "টি" মডেলের গাড়ী। গাড়ীর সঙ্গে উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইল; উদ্দেশ্য, কোন অংশ ভাঙ্গিয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে যেন উহা মেরামত না করিয়া নূতন অংশ কিনিয়া লাগান যায়। এই অংশ-গুলির মূল্যও করা হইল যথা সম্ভব সস্তা। তাহা ছাড়া প্রত্যেক কলকব্জার দোকানে, ফোর্ড গাড়ীর প্রত্যেক দোকানে এই অংশগুলি মজুত রাখা হইল। নূতন মডেলের গাড়ীর কলকব্জা খুব সহজ হওয়ায় তৈয়ারী করিবার ব্যয় পড়িত খুব কম। অতি সস্তাদরে উহা বিক্রয় করিতে পারিতাম। "টি" মডেলের কলকব্জা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাই আমার শেষ মডেল। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য অনেক গাড়ীই তৈয়ারী করিয়াছিলাম। কিন্তু "টি" মডেলের গাড়ী আমার ব্যবসায়ের ধারা বদলাইয়া দিল। এখান

হইতেই ফোর্ড কোম্পানীর উন্নতির সুরু। গতানুগতিক ধারায় না চলিয়া নূতন পদ্ধতিতে কাজ করিলে সকলেই এই প্রকার উন্নতি করিতে পারে। আমার প্রথম তৈয়ারী বিভিন্ন মডেলের গাড়ীর যাহা কিছু ভাল সকলই রহিয়াছে "টি" মডেলে, এজন্য ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কখনও ভাবি নাই। আমার কর্ত্তব্যের সফলতা ছিল সুনিশ্চিত।

যাহা বলিলাম, সবই ১৯০৮-৯ সালের কথা। তখন আমাদের কোম্পানীর বয়স হইয়াছে মাত্র পাঁচ বৎসর। আমাদের প্রথম কারখানা ছিল চার কাঠা পরিমাণ জমির উপর একটা বাড়ীতে এবং উহার ছোটখাটো একটা ব্রাঞ্চ ছিল। সেই বৎসর কারখানায় কাজ করিয়াছে ৩১১ জন এবং মোটর তৈয়ারী হইয়াছে ১৭০৮ খানা। ১৯০৮ সালে দুই বিঘারও কিছু বেশী জমির উপর নূতন কারখানা করিলাম। আগে ছিলাম ভাড়াটে বাড়ীতে, এবার নিজেদের বাড়ী হইল। কারখানায় কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া হইল ১৯০৮ জন। সে বৎসর গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল ৬১৮১ খানা। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রথম শাখা অফিস ছাড়া আরও তেরটি শাখা অফিস গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথম বৎসর বাজারে বিক্রয় করিলাম ১০,৬০৭ খানা। মোটর ব্যবসায়ীদের পক্ষে এত অধিক গাড়ী বিক্রয় করা কি নূতন নয়? গাড়ীর দাম ঠিক করিয়াছিলাম ৮৫০ ডলার।

এবার স্পষ্ট বুঝিলাম ব্যবসায়ে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিবার পক্ষে এই আমার প্রকৃষ্ট সময়। এদিকে গাড়ীর অপ্রত্যাশিত বিক্রয় দেখিয়া বিক্রেতারা চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিল আরও নূতন

মডেলের গাড়ীর জন্য। তাহাদের ধারণা হইল যত নূতন নূতন মডেলের গাড়ী তৈয়ারী হইবে বিক্রিও তত বেশী হইবে। এ সম্বন্ধে তাহারা দুই চারিজন গ্রাহকের চাহিদার কথাও বলিতে ছাড়িত না। আশ্চর্য্য এই যে, তাহারা সেই দুই চারিজনের কথা ভাবিতে যাইয়া বাকী শতকরা ৯৬ জন গ্রাহকের কথা ভুলিয়া যাইত। ক্রেতাদের তাহারা গাড়ীর গুণ বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিত না।

ইতিমধ্যে ১৯০৯ সালে একদিন কোম্পানীতে নোটিশ দিয়া জানাইলাম যে, অতঃপর ফোর্ড-কোম্পানীতে "টি" মডেলের গাড়ী ছাড়া অন্য কোন রকম গাড়ী তৈয়ারী করা হইবে না। সকল গাড়ীর কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম ও গঠনপ্রণালী থাকিবে এক রকমের। সঙ্গে একথাও জানাইয়া দিলাম যে, কোন ক্রেতা ইচ্ছা করিলে গাড়ীর রং নিজের পছন্দমত করাইয়া লইতে পারেন।

আমার এই অভিনব ঘোষণায় সকলের মনেই খট্‌কা লাগিয়া গেল। এদিকে গাড়ীর দামও কমাইয়া দিয়াছিলাম। বিক্রেতারা বলিল. গাড়ীর দাম কমাইলে বিক্রি কমিয়া যাইবে ; তাহা ছাড়া যাহারা সস্তা জিনিষ না চাহিয়া ভাল জিনিষ চায় তাহারা ফোর্ড কোম্পানীর দরজা মাড়াইবে না। আশ্চর্য্য ! মোটর ব্যবসা সম্বন্ধে তখনও লোকের চক্ষু খোলে নাই। সকলেই মনে করিত মোটর ধনীর বিলাস-ব্যসনের দ্রব্য ছাড়া আব কিছুই নয়। এই বদ্ধমূল ধারণা যেন তাহারা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না। ইহার পর যখন প্রচার করিলাম, ফোর্ড গাড়ীর সরঞ্জাম থাকিবে খুব ভাল কিন্তু দাম হইবে খুব সস্তা তখন বাজারে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। মোটরের ব্যবসা করিয়া অথবা ব্যবসার সংশ্রবে থাকিয়া যাহারা

ঝুনো হইয়া গিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিত তাহাদের মধ্যে দুই একজন একথাও বলিতে ছাড়িল না যে, ফোর্ড কোম্পানীকে ছয় মাসের মধ্যেই পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। নিজেদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা ফোর্ড কোম্পানীর আয়ু পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

সস্তায় ভাল গাড়ী হইতে পারে, একথা কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু ১৯০৮-৯ সালের বিক্রি সকলের ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। পিকোয়েট ষ্ট্রীটে আমাদের যে কারখানায় গাড়ী তৈয়ারী হইত তাহাতে স্থানাভাব হইয়া পড়িল। দেখিলাম কারবার যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সেখানে স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। এজন্য ডেট্রয়েটের নিকট হাইল্যাণ্ড পার্কে প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ক্রয় করা গেল। জায়গাটা সহর হইতে কতকটা দূরে হইলেও কারখানা তুলিবার পক্ষে খুব ভাল মনে হইল। অতবড় জায়গা জুড়িয়া মোটরের কারখানা খুলিবার চেষ্টা পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। তখনও ফোর্ড কোম্পানী দরজা বন্ধ করিতেছে না দেখিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিল, "আর কতকাল এভাবে চলিবে?" ইহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন যে কতবার কত লোকের মুখে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

নূতন কারখানা করিতে ব্যয় অনেক পড়িয়া গেল দেখিয়া গাড়ীর মূল্য সামান্য বাড়াইয়া দিলাম। "টি" মডেলের গাড়ীর মূল্য ৯৫০ ডলার করা হইল। ব্যবসায়ের নীতি হিসাবে মূল্য বৃদ্ধি করা আমি অন্যায় মনে করি নাই। নূতন কারখানা করিতে যে অর্থ ব্যয় হইল তাহা হয়তো আমি ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা করিলে প্রতি বৎসর সুদের জের টানিতে হইত এবং গাড়ীর

দাম বাড়াইয়াই সেই সুদ দিতে হইত। ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হইত আরও বেশী।

১৯০৮ সাল ও ১৯১১ সালের মধ্যে ফোর্ড কোম্পানীর অবস্থা একবার তুলনা করিয়া দেখা যাক্। ১৯০৮ সালে কারখানা ছিল আড়াই বিঘা তিন বিঘা জমির উপর এবং লোক খাটিত ১৯০৮ জন। ১৯১১ সালে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে প্রায় দেড়শত বিঘা জমির উপর এবং লোক খাটিত ৪১১০ জন। ১৯০৮ সালে গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলাম ছয় হাজারের কিছু বেশী। ১৯১১ সালে হইয়াছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার। এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ যেরূপ বাড়িয়াছে লোক সংখ্যা সেই হিসাবে বাড়ে নাই। ফোর্ড কোম্পানী কিরূপে এইরূপ করিল তাহা কেহ ভাবিয়াছে কি ?

একমাত্র যন্ত্রশক্তির দৌলতেই আমরা ব্যবসা জগতে এতটা পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছি। পূর্ব্বে দেশী কর্ম্মকার তাহার সেই জীর্ণ কুটীরের এক কোণে মামুলি যন্ত্রপাতি লইয়া, সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একদিনে তৈয়ারী করিত তিন চারটী, না-হয় বড় জোর পাঁচ সাতটি জিনিষ। তাহাও আবার সবগুলি ঠিক হইত না। অনেক খাটুনি বৃথা যাইত। আর নেহাৎ ভাগ্যগুণে যাহা বিক্রয় হইত তাহার জন্য ক্রেতাকে দিতে হইত বেশী দাম, অথচ নির্ম্মাণকারীর শ্রম তাহাতে পোষাইত না। কিন্তু যন্ত্রদেবতার কল্যাণে সেই জিনিষই তৈয়ারী হইতেছে আজ প্রতি মিনিটে শত শত; অথচ দাম পড়িতেছে সস্তা এবং জিনিষ হইতেছে সহস্রগুণ ভাল। কোন জিনিষের এদিক-ওদিক হইবার উপায় নাই।

এই প্রথায় কাজ করিয়াই আমরা ফোর্ড গাড়ীকে খুব সস্তা দরে বাজারে চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমাদের জিনিষও ছিল খুব ভাল।

ব্যবসার জগতে আমাদের অনুসৃত নীতি ছিল একটা ভাবের প্রকট মাত্র। মনে বহুদিন যাবৎ যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। যাঁহারা চিন্তাশীল ও ভাবুক জগতের উপকারার্থে তাঁহারা এই ভাবেই কাজ করিয়া থাকেন। নবভাবের ভাবুক এই প্রকারেই বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিতে যাহারা তাহাকে সাহায্য করিয়াছে সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের দানও কম নহে। প্রতিষ্ঠানের লাভালাভ, উত্থান-পতনের অংশও তাহারা সমান ভাবে পাইবার অধিকারী। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি হাজার লোক কাজ করিয়া থাকে তাহা হইলে কেহই দাবী করিয়া বলিতে পারে না, "আমি প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়াছি।" সামান্য কুলী মজুরের দানও উক্ত প্রতিষ্ঠানে কম নহে। প্রকাণ্ড লোহার ফ্রেমের উপর যে ইমারৎ তৈয়ারা হয় সামান্য ইষ্টক খণ্ডই তাহার উপাদান। আমাদের কোম্পানীও গড়িয়া উঠিয়াছিল ঠিক এই ভাবে। সে কথা পরে বলিব।

ইতিমধ্যে আমাদের কোম্পানীর নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লণ্ডন ও অষ্ট্রেলিয়ায় আমরা শাখা স্থাপন করিয়াছি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমরা মোটর পাঠাইতেছি। ইংলণ্ডে আমাদের মোটর আমেরিকার মতই নাম করিয়াছে, কিন্তু প্রথম দিকে ইংলণ্ডের বাজারে মোটর চালাইতে আমাদের বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শুধু এই যে, আমেরিকার সাইকেল

ইংলণ্ডের বাজারে মোটেই চলে নাই। ইংলণ্ডের সাইকেলের তুলনায় আমেরিকার সাইকেল হইয়াছিল খুবই খেলো; সেই অজুহাত ইংলণ্ডের মোটর ব্যবসায়ীরা আমাদের মোটরকেও খেলো বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ১৯০৩ সালে দুইখানি "এ" মডেলের গাড়া ইংলণ্ডে রপ্তানী করি। কিন্তু উহার প্রতি কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। ইংলণ্ডে জোর গুজব রটিল যে আমাদের গাড়ীর বেশীর ভাগই দড়ি, পাটের আঁশ ইত্যাদিতে ভরা। খুব বেশী টেকসই হইলেও গাড়ী পনের দিনের বেশী টিকিবে না। তা'ও যদি টেকে নেহাৎ কপালের জোরে। প্রথম বৎসর আমাদের বিক্রি হইল ইংলণ্ডে মাত্র বারখানা গাড়ী। পরের বৎসর সামান্য দু'এক-খানা বাড়িল। কিন্তু আমি জানি কুড়ি বৎসর পরেও আমাদের প্রথম প্রেরিত গাড়ীগুলি ইংলণ্ডে কোন না কোন কাজে নিযুক্ত ছিল। ইহাতেই বুঝা যায় আমাদের গাড়ীগুলি কিরূপ মজবুত।

১৯০৫ সালে স্কটল্যাণ্ডে মোটর গাড়ীর কলকব্জার শক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে একটা প্রতিযোগিতা হইল। আমাদের এজেণ্ট সেখানে একখানা "টি" মডেলের গাড়ী পাঠাইলেন। প্রায় আটশত মাইল প্রস্তরময় বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ফোর্ড অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। ইংলণ্ডে ফোর্ড গাড়ীর জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। আমাদের গাড়ী প্রচুর বিক্রয় হইতে লাগিল। সেই বৎসরই লণ্ডনে প্রথম ফোর্ড ট্যাক্সির প্রচলন হয়। স্কটল্যাণ্ড ছাড়াও ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রতিযোগিতায় ফোর্ড গাড়ী বিজয় গর্ব্বে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ একটি প্রতিযোগিতার ফলেই ১৯১১ সালে ইংলণ্ডে আমাদের "টি" মডেলের গাড়ী বিক্রয় হইল ১৪০৬০ খানা।

ইহার পর আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারে কারখানা খুলিয়াছি। প্রথমে সেখানে শুধু মোটরের বিভিন্ন অংশ একত্র সন্নিবেশ গাড়ী তৈয়ারী করা হইত। সরঞ্জাম ও অংশগুলি যাইত আমাদের আমেরিকার কারখানা হইতে। পরে ম্যাঞ্চেষ্টারেই গাড়ার অধিকাংশ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

—পাঁচ—

কারখানার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিলে আমাদের ব্যবসার মূল নীতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইবে। নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া পণ্যোৎপাদনে ব্যয় হ্রাস করিবার নীতিই রহিয়াছে আমাদের উন্নতির মূলে। একমাত্র যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এইরূপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। কথাগুলি একটু বুঝাইয়া বলা দরকার।

যে-কোন প্রকারের অপব্যয় নিবারণের জন্য নানাভাবে চিন্তা ও অনুশীলন করিয়া আমরা সর্ব্বদা নূতন কলকব্জা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া থাকি। ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে এইরূপ না করাই ভুল। কোন নূতন উপায়ে একটা কাজ করিলে যদি শতকরা দশ টাকা হিসাবে ব্যয় কমিয়া যায় তাহা হইলে উহা না করিবার অর্থ ব্যবসায়ে উক্ত হিসাবে ট্যাক্স ধরা। আরও সহজ কথায় বলা যায় যে, সেই টাকাটা আমাদের দোষে অযথা নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ঘণ্টায় পাঁচ ডলারের কাজ করে নূতন উপায় অবলম্বন করিলে সেই সময়ের মধ্যেই যদি আরও সহজে তাহা দ্বারা সাত ডলারের কাজ করান যায়, তাঁহা হইলে লাভটা খুব কম হয় না। একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই এইরূপ করা সম্ভব। আজ জগতের সর্ব্বত্র যে গগনস্পর্শী



ফোর্ডের জন্মস্থান

বিশাল ইমারৎগুলি গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মূলেও রহিয়াছে বিজ্ঞান। পাঁচতলা ইমারৎ করিতে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন পঞ্চাশতলার জন্যও উহার অধিক জমি লাগিতেছে না। পূর্ব্বে পাঁচতলা বাড়ী করিতে যে ব্যয় হইত এখন সেই ব্যয়েই পঁচিশতলা বাড়ী হইতেছে। ইহা কি শুধু বিজ্ঞানের বলেই সম্ভব হয় নাই? আমাদের কারখানায় যে বাব চৌদ্দ হাজার লোক কাজ করিতেছে কাজেব সময় যদি তাহাদের প্রত্যেককে দিনে দশ পা' করিয়া কম হাটিতে হয় তাহা হইলে মোটেব উপর যে পথটা কম হাটিতে হইল তাহাব পরিমাপ হইবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। এইজন্য যে বৃথা শক্তিক্ষয় হইত নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা তাহা বাঁচাইয়া দিয়াছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যয় সংক্ষেপের উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা কাজ করিতেছি। হাতে-কলমে কাজ করিবার সময় গলদগুলি আস্তে আস্তে ধরা পড়িয়াছে। প্রথম প্রথম আমরা খোঁজ করিতাম কলকব্জার কাজ করিতে খুব সুদক্ষ ব্যক্তিদেব। কিন্তু কাজ যখন খুব বাড়িয়া গেল তখন বুঝিলাম প্রয়োজন মত সুদক্ষ লোক পাওয়া অসম্ভব—প্রকৃত পক্ষে কাজের জন্য সুদক্ষ লোকের প্রয়োজনও নাই। আমাদের এই অভিজ্ঞতা হইতেও ব্যবসায়ের নীতি অনেকটা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। সে কথা পরে বলিব।

নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার ও নূতন কর্ম্মপদ্ধতি উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যখন বহু নূতন লোক কারখানায় লইতে আরম্ভ করিলাম তখন অনেকেই বলিয়াছিল যে, আমরা সুদক্ষ কারিগরের ভাত মারিতেছি এবং শ্রমিকদের উদ্ভাবনীশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা তাহাই করিয়াছি কি? মোটেই নয়, বরং

আমরা কারখানায় বহু ওস্তাদ ও চিন্তাশীল লোক গড়িয়া উঠাইতেছি। কারখানায় নিযুক্ত লোকদের আমরা শিখাইতেছি নূতন কার্য্য-প্রণালী, বুঝাইতেছি নিত্য নূতন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা। তাহাদের দক্ষতার ফলই ভোগ করিতেছে দেশের জনসাধারণ, দেশের সহস্র সহস্র লোক। তবু কি বলিতে হইবে আমরা সুদক্ষ ব্যক্তিদের মর্য্যাদা রাখিতেছি না?

তাহা ছাড়া আমাদের কারখানায় যদি শুধু সুদক্ষ লোকেরই প্রয়োজন হইত, তবে কোম্পানী কোন দিন গড়িয়া উঠিত না। আর যদি-বা গড়িয়া উঠিত, এতগুলি লোককে কাজে পাকা করিয়া তুলিতে লাগিত একশত বৎসর। আমাদের কারখানায় একদিনে যে কাজ হয়, তাহা হাতে করিতে হইলে প্রয়োজন হইবে প্রায় দশ লক্ষ লোকের। অন্যান্য অসুবিধার কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

ফোর্ড কোম্পানীর কারখানার কার্য্যপদ্ধতি একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। নিজেদের কারখানায় মোটরের বিভিন্ন অংশগুলি যতই তৈয়ারী হইতে লাগিল, কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে লাগিলাম। প্রথম আমরা তৈয়ারা করি "টি" মডেলের গাড়ীর সরঞ্জাম। শ্রমিকগণ মোটরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তৈয়ারী করে এবং যাহারা গাড়ী গড়ায় তাহাদের কাজের পথ সহজ ও সরল করিয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে আমাদের শ্রমিকগণ সকলেই সুদক্ষ কারিগর। কাজ করিয়া করিয়া তাহাদের হাত পাকা হইয়া গিয়াছে। তাহারা প্রথম যখন আমাদের কারখানায় আসে তখন সকলেই ছিল অত্যন্ত কাঁচা। কিন্তু পাকা হইতে তাহাদের বেশী দিন লাগে না। আমাদের কাজের ব্যবস্থা এত সহজ যে, যে-কোন

লোক কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েক দিনের মধ্যেই যে-কোন কাজ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। কেহ না পারিলে বুঝি তাহা দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না।

ফোর্ড কোম্পানীর অধিকাংশ লোকই বিদেশী। দেখিয়াছি বিদেশীরাই আমাদের কাজে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে অধিক। কারখানার কাজের জন্য যে খুব বলশালী লোকের দরকার তাহা নয়। অবশ্য কোন কোন কাজে গায়ের জোরও যথেষ্ট লাগে কিন্তু সে খুব কম জায়গায়। এই সকল কাজও ক্রমশঃ সহজ করিয়া ফেলা হইতেছে। কারখানার বেশীর ভাগ কাজই খুব সহজ—এত সহজ যে বুঝাইয়া দিলে তিন চার বৎসরের শিশুও তাহা অনায়াসে করিতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে জগতের শিল্প-ব্যবসায়ের ধারা যে ভাবে চলিবে ফোর্ড কোম্পানী সেই ভাবেই চলিতেছে। ফোর্ড দুনিয়ায় নূতন কিছু করে নাই। ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের পথে সে অগ্রণী মাত্র।

একখানা ফোর্ড গাড়ীতে ছোট বড় সকল অংশ লইয়া প্রায় পাঁচ হাজার অংশ আছে। সবগুলি তৈয়ারী হয়, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে। গাড়ী তৈয়ারী করিবার সময় সেগুলিকে আনিয়া একত্র জড় করা হয়। পূর্ব্বে এগুলি শ্রমিকেরা ঘাড়ে করিয়া আনিত, কিন্তু এখন সব কাজই হয় কলে। কাজ খুব বাড়িয়া যাওয়ার ফলেই কলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখিয়াছি শ্রমিকেরা কাজের জন্য হাটাহাঁটি করিয়া সময় নষ্ট করে বেশী। আমাদের কোম্পানীর অবস্থাও পূর্বে এইরূপ ছিল। কিন্তু এখন আর আমাদের শ্রমিকদের কাজের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয় না; কাজই শ্রমিকদের কাছে

ছুটিয়া আসে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হাটিতে হইলে এখন আমাদের কর্ম্মচারীদের এক পা'র অধিক হাটিতে হয় না। প্রায় সকলেই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া কাজের সমস্ত জিনিষ পায়।

কাজের সুবিধার জন্য আমরা সর্ব্বদা কারখানাকে এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছি যে, প্রত্যেকটি অংশ তৈয়ারী হইবার সময় পর্য্যায়ক্রমে উহা সমস্ত লোকের হাত দিয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। যে যাহার কাজটুকু শেষ করিয়া হাতের সামনে ঝুড়িতে ফেলিয়া দিলেই হইল। সঙ্গে সঙ্গে উহা আপনা হইতেই পরবর্ত্তী লোকের নিকট চলিয়া যাইবে। যেখানে গাড়ী গড়িয়া তোলা হয় সেখানেও ঠিক একই নিয়ম। আমাদের এই ব্যবস্থার আর একটা সুবিধা এই যে, কোন শ্রমিক এক মূহুর্ত্ত সময়ও নষ্ট করিতে পারে না। কাজে একটু গাফিলতি করিলেই একজনের জন্য সমস্ত কারখানার লোকের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। এইজন্য আমরা চাই, আমাদের কারখানার শ্রমিকগণ হইবে পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। কাজে ঢুকিলে তাহারা হয়ও তাহাই। আমাদের কাজের নিয়মের আর একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে শারীরিক পরিশ্রম আদৌ নাই—শুধু যে কাজটুকু করিবার তাহাতে অবহেলা না হইলেই হইল।

১৯১৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আমরা যন্ত্রসাহায্যে বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করি। প্রথমে যে ভাবে কাজ করা হইত এখন অবশ্য তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পরে অধিকতর সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হইলে বর্ত্তমান প্রণালীও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সহজ পন্থাকে আমরা চিরকালই সাদরে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি।

যেখানে গাড়ী তৈয়ারী করা হয় সেখানকার কথাটা একটু ভাল করিয়া বলিলে ফোর্ড কোম্পানীর কাজ সম্বন্ধে কতক ধারণা হইবে। কাজের সুবিধার জন্য গাড়ী প্রস্তুত করিবার জায়গায় রেল বসান হইয়াছে। মোটরের ফ্রেম হইতে গাড়ী তৈয়ারী হইয়া বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ৪৫টি বিভাগের ভিতর দিয়া গাড়ীটিকে যাইতে হয়। প্রথম বিভাগ গাড়ীর ফ্রেমে শুধু মাডগার্ড আঁটিয়া দিল; এই প্রকারে চৌত্রিশ হাত বদল হইবার পর গাড়ীতে বসিল ইঞ্জিন। তারপর ৪৫শ ব্যক্তির হাত হইতে খালাস পাইয়া "ফোর্ড মোটর" জন আর ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া আসিল। জন-আর-ষ্ট্রীট হাইল্যাণ্ড পার্ক কারখানার মধ্যবর্ত্তী রাস্তা।

আমাদের এই কার্য্য পরম্পরায় যে গাড়ীতে "মাডগার্ড" আঁটিয়া দিল, সে হয়তো উহাতে বল্টু বসাইল না। যে বল্টু বসাইল সে তাহা আটকাইল না—আটকাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে তাহার পরের লোক। ইঞ্জিন বসাইবার পূর্ব্বে ইঞ্জিনের সমস্ত অংশও এই প্রথায় ঠিক হইয়া থাকে। বিভিন্ন অংশগুলিও কাজের সঙ্গে সঙ্গে কলের সাহায্যে ঠিক সময় মত যাহার যেখানে প্রয়োজন সেখানে আসিয়া পড়ে। কারখানার সমস্ত জিনিষগুলিই রহিয়াছে নড়াচড়ার উপর। কোথাও নড়ে মাথার উপর, কোথাও হাতের সামনে, কোথাও রেল লাইনে।

পূর্ব্বে আমাদের এক কারখানায়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ তৈয়ারী হইত কিন্তু এখন হয় আমাদেরই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায়। এজন্য রুজ নদীর তীরে একটা কারখানা খোলা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারখানা করায় শ্রমিকদের থাকিবার পক্ষেও অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

হাইল্যাণ্ড পার্কে আমাদের কারখানায় প্রায় পাঁচশত বিভাগ রহিয়াছে। পিকোয়েটের কারখানায় ছিল মাত্র আঠারটি বিভাগ। পূর্ব্বে হাইল্যাণ্ড পার্কেও ছিল দেড়শত ডিপার্টমেণ্ট। আমাদের কারখানা ক্রমে ক্রমে কতটা উন্নতি করিয়াছে ইহা হইতেই বুঝা যায়। নব নব উদ্ভাবনীর ফলে ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

একবার কোন একটা নূতন মেসিন তৈয়ারী করিবার জন্য কর্ম্মচারীদের ডাকিলাম। মেসিন প্রস্তুত করিলে তাহা দ্বারা কোন একটা জিনিষ ঘণ্টায় দুইশত করিয়া তৈয়ারী হইবে। আমার কথা শুনিয়া একজন বলিলেন, "ভুল বলিতেছেন। ঘণ্টায় নয়, প্রতিদিন দুইশত করিয়া তৈয়ারী হইতে পারে। ঘণ্টায় দুইশত তৈয়ারী করা অসম্ভব।" তখন মেসিনের আবিষ্কারককে ডাকিয়া সাক্ষাতে যন্ত্রটি দেখান হইল। কাজের সুবিধার জন্য এইরূপ কত যন্ত্র যে ফোর্ড কোম্পানীতে আবিষ্কার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেকটা আবিষ্কার বা পরিবর্ত্তনের সময় বাধা-বিঘ্ন ওজর-আপত্তিও হইয়াছে বিস্তর। সে সকল কথা বিশেষ করিয়া না-ই বলিলাম।

আমাদের কারখানায় "বিশেষজ্ঞ" বলিয়া কেহ নাই। যখন দেখি কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে তখন তাহাকে কাজ হইতে বিদায় দেওয়াই ভাল মনে করি। কারণ, যাহারা প্রকৃত কর্ম্মী তাহারা কখনও নিজেকে কোন কাজে বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারে না। সর্ব্বদা তাহাদের লক্ষ্য থাকে কাজের উন্নতির দিকে। হৃদয়ে অসীম স্পৃহা, বক্ষে অদম্য উৎসাহ লইয়া তাহারা অগ্রসর হয় কাজের পথে। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,

"বিশেষজ্ঞ" এই ভাবটা মনকে অসার, কর্ম্মীকে আত্মম্ভরী করিয়া তোলে এবং উন্নতির পথে হয় প্রতিবন্ধক।

জগতে 'অসম্ভব' বলিয়া কোন কিছু আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। এই জিনিষটা হইবে কিংবা এই কাজটা হইবে না তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেহ বলিতে পারে বলিয়াও আমার মনে হয় না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'অসম্ভবের' মাত্রাটা কমিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু সকল সময় তাহা হয় কি? অনেক সময় দেখা যায় কোন ব্যক্তি একটা কাজে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে অকেজো বলিয়া বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। লোকটির চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার কাজের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় বেশী। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কোন কাজের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া কোন বিশেষজ্ঞ আখ্যাধারী ব্যক্তি যদি বলে "কাজটা হইবে না" তখন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া শতকরা প্রায় ৯৫ জনই বলিল, "তাইত, এ হওয়া অসম্ভব।" আমার নিজের বেলাও এই রকম অনেকবার দেখিয়াছি।

ক্রমাগত নানারূপ যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে হাতে কাজ করিবার প্রথা আমাদের কারখানায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। কলে কাজ করা হয় বলিয়া সেখানেও আমাদের বিরাম নাই। কল প্রায় প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন হইতেছে। লক্ষ্য, কিরূপে আরও সহজে, আরও কম ব্যয়ে জিনিষ তৈয়ারী করা যায়। এজন্য আমাদের কারখানায় কলের সংখ্যাও খুব বেশী। প্রত্যেক বর্গফুট স্থান হিসাব করিয়া আমরা কারখানায় যন্ত্রপাতি বসাইয়াছি। এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও বৃথা পড়িয়া থাকিতে দেওয়া হয় না। অথচ প্রত্যেক লোকের কাজের জন্য

যতটা স্থানের প্রয়োজন ঠিক ততটাই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ক্রম অনুসারে কাজগুলিকে এমন ভাবে ভাগ করা হইয়াছে যে দিনরাত্রি কাজ চলিতেছে, এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ইহাই আমাদের ব্যবসার মূল-নীতি। এই প্রণালীতে কাজ করিয়া আমরা পণ্যোৎপাদনের ব্যয় কিরূপ হ্রাস করিয়াছি তাহা শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যে অনুপাতে কারখানায় এখন মোটর তৈয়ারী হয়, প্রতি মোটরের জন্য যদি আমরা এখন ১৯০৩ সালের হিসাবে লোক নিযুক্ত করিতাম- এখানে শুধু মোটরখানা গড়িয়া তুলিবার কথা বলিতেছি—তাহা হইলে আমাদের দুই লক্ষেরও অধিক লোকের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এখন দৈনিক চারি হাজার করিয়া মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য আমাদের লোক খাটিতেছে পঞ্চাশ হাজারেরও কম। ব্যবসার বাজারে আয় হিসাবে এই অঙ্কটা কি অধিক নহে?

—ছয়—

এখন আমাদের আফিসের কাজের নিয়মকান্নন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। সাধারণতঃ বড় বড় কোম্পানী ও আফিসে আট-ঘাট বাঁধা যে আইন থাকে আমাদের তাহা নাই। প্রায় সব বড় বড় কোম্পানী আফিসেই আইন, নিয়ম-কান্নন ইত্যাদি লইয়া একটা কসরৎ হয়। ফোর্ড কোম্পানী সেই কসরৎটা ছাড়িয়া দিয়াছে। সকল জায়গাতেই দেখিয়াছি নিম্নতন কর্ম্মচারীদের কোন অভিযোগ বড়-কর্ত্তার কাছে পৌছাইতে হইলে অনেক লেখালেখি, অনেক তদ্বির করিতে হয়। তারপর যখন অভিযোগ নিষ্পত্তির সময় আসে তখন এতদিন চলিয়া যায় যে, অভিযোগের ব্যাপারটা হইয়া পড়ে ছোট-খাটো একটা ইতিহাস। অভিযোগের আসল কথাটা তখন আফিসের নিয়ম-কান্ননের বিপুল চাপে পড়িয়া পিষিয়া যায়।

আমাদের আফিসে এই সব আট-ঘাটের কষাকষি নাই। আমরা চাই কাজ, নালিশ অভিযোগ চিঠিপত্র লেখালেখির জন্য আমরা আফিস করি নাই। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে কর্ম্মচারীদের কোন প্রকার স্তর ভেদ নাই, ব্যক্তি বিশেষের কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই, কর্ম্মচারীদের নামের পেছনে মোটা মোটা খেতাব নাই কিংবা আফিসে ঘন ঘন সভাসমিতির বালাই নাই। যাহার যে কাজ করিয়া গেলেই

হইল। বহু লোকের একসঙ্গে কাজ করিতে হইলে যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকা একান্ত দরকার তাহা আমার মনে হয় না। এক বিভাগের লোকের অন্য বিভাগের কাজের খবরের প্রয়োজন কি ? আমি মনে করি পরস্পরের সৌহার্দ্দের বরং একটা অসুবিধা আছে। ইহা উভয়ের পক্ষেই খারাপ। সৌহার্দ্দের ফলে একজনের দোষ অপরে লুকাইতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর উপর আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছি। সাধারণ কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে কয়েকজন লোক রহিয়াছে। তাহারা নিজেই নিজেদের কাজ বাছিয়া লইয়াছে। ইহাতে অফিসের গালভরা নামের আরম্বর কিংবা ফাঁকা কর্ত্তৃত্বের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, কাজ করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, কাজ লইয়া তাহাদের কখনও গোলমাল হইতে পারে না। কাজই ফোর্ড কোম্পানীর শাসনদণ্ড। কাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা কর্ম্মচারীদের মোটা মোটা খেতাব দেওয়া বন্ধ করিয়াছি। আমাদের কোম্পানীতে কোন শ্রমিকের কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহার সেই বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকট সরাসরি যাইতে মোটেই বাধা নাই। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে অন্যায় অবিচার হয় খুব কম। আমরা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্যও করি না। দেখা গিয়াছে যে, তথাকথিত উচ্চতর কর্ম্মচারীদের অযথা কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার দোষেই বড় বড় কোম্পানীগুলিতে শ্রমিকদের লইয়া গোল বাধে বেশী।

তাহা ছাড়া মোটা খেতাবের আরও অনেক দোষ রহিয়াছে। উপাধির মোহ ভয়ানক জিনিষ। আফিসে মোটা রকমের একটা নাম লইয়া বসিবার অর্থ আসল কাজ হইতে রেহাই পাওয়া। সহজ

কথায় বলিতে হয়, কর্ত্তৃত্ব করাই বড় কর্ম্মচারীদের প্রধান ও একমাত্র কাজ। খেতাবধারীদের মাতব্বরি যে শুধু তাহাদের পক্ষেই ক্ষতিকর তাহা নহে। কর্ম্মচারীদের মধ্যেও ইহা অসন্তোষ সৃষ্টি করে। প্রকৃত যাহারা কর্ম্মী, দেশের ও দশের যাহারা নেতা তাহাদের কোন খেতাব আছে কিনা সন্দেহ। থাকিলেও তাহা বুঝিতে পারা অত্যন্ত দুষ্কর। কর্ম্মচারীদের মধ্যে মোটা মোটা নামের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে দায়িত্ব জ্ঞানও থাকে কম। তাহাদের কে কোন কাজের জন্য দায়ী তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। এই সকল স্থানে হয় কাজের যত বিশৃঙ্খলা। রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্মপ্রণালী ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারী দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, যেখানে কঠোর নিয়ম কানুনের নাগপাশ কোম্পানীর উন্নতি কামনায় শ্রমিকের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে নাই; সেখানে দোষ ত্রুটি চোখে পড়িলেই তাহা শোধরাইবার অধিকার সকলের থাকে সেই কোম্পানীর কাজই হইবে অনিন্দণীয়।

কারখানার কাজে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য আমাদের স্বতন্ত্র একটি বিভাগ রহিয়াছে। সেখান হইতেই সমস্ত লোক নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কারখানায় বিশেষজ্ঞদের আদর নাই, এজন্য তাহাদের লওয়াও হয় নাই। সকলের নীচের স্তর হইতে আমরা কাজে লোক নিযুক্ত করি। লোক নিযুক্ত করিবার সময় তাহার বিগত জীবনের কার্য্যাবলীর কৈফিয়ৎ আমরা লই না, কিংবা বিগত জীবনের কোন আপত্তিকর কার্য্যের জন্য তাহাকে ফিরাইয়াও দেই না। একটা মানুষ খারাপ হইতে পারে, তাই বলিয়া তাহার প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ নাই একথা আমি কোন দিনই বিশ্বাস

করি না। দেখিয়াছি জীবনে ভাল হইবার সুযোগ পাইলে খারাপ বলিয়া যাহাদের অখ্যাতি আছে তাহারাও অনেক সময় ভাল হইয়া যায়। এজন্য কাহারও বিগত জীবনের ইতিহাসকে আমরা আমল দেই নাই। একবার যে অন্যায় করিয়া জেলে গিয়াছে সে যে আবার জেলে যাইবে তাহার অর্থ কি ? বরং সুযোগ দিলে ভাল হইতে চেষ্টা করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা নিযুক্ত করি লোক— কাহারও জীবনের ঘটনাবলীকে আমরা নিযুক্ত করি না। এই নীতি অনুসারে কাজ করিয়া আমরা কাহারও বাড়ী ঘরের খোঁজ করি নাই, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নাই বলিয়া আপত্তি করি নাই। আমরা দেখি প্রার্থী কাজ করিতে ইচ্ছুক কি-না। তবু ভাল লেখাপড়া জানাটা বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা থাকে বেশী। ভাল কাজ করিলে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই।

চিরাচরিত প্রথামত না চলিয়া কর্ম্মচারীদের প্রমোশনের বেলাও আমাদের কোম্পানীতে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি। সকল স্থানেই দেখিয়াছি বড়কর্ত্তাদের নজরে না পড়িলে প্রমোশন পাওয়া কষ্টকর ; এজন্য তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলেরই একটা চেষ্টা থাকে। কর্ত্তার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ফন্দি-ফিকিরেরও অন্ত থাকে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে কাজটা তাহাদের চোখে বড় না হইয়া কর্ত্তার নজর পড়িবার লক্ষ্যটাই হয় বড়। কোম্পানীর ইহাতে লাভ না হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফলে অনেক সময় হয়তো যাহারা প্রমোশন পাইবার যোগ্য তাহারা না পাইয়া পায় অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত লোক। এখানে আফিসের কর্ত্তাদের আমি দোষ দিতেছি না। চাটুকারিতায় মুগ্ধ হইবার দুর্ব্বলতাটুকু থাকা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এইরূপ নানাদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা প্রমোশন বা পদোন্নতির ব্যাপারে ব্যক্তি-বিশেষের কৃপায় অন্যায় উপকরণটা দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি।

চিন্তাশীল ও কর্ম্মঠ ব্যক্তিদের ফোর্ড কোম্পানীতে আশানুরূপ উন্নতি হইবেই। অবশ্য যাহারা শুধু দৈহিক শ্রমে সক্ষম তাহারা উন্নতির চরম শিখরে না উঠিতে পারিলেও যোগ্যতা অনুসারে যথেষ্ট প্রমোশন পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি পণ্যোৎপাদন ও কর্ম্ম-প্রণালীর ক্রমোন্নতিই আমাদের চরম লক্ষ্য। অতএব স্বীয় চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে যাহারা কোন প্রকার কর্ম্মোন্নতির উপায় আবিষ্কার করিতে পারে তাহাদেরই আমরা প্রমোশন দিয়া থাকি। আবিষ্কার ছোট হইল কি বড় হইল তাহা আমরা সর্ব্বদা বিচার করি না। আমরা দেখি তাহার কাজ। অনেক সময় ছোট ছোট জিনিষ উদ্ভাবনের ফলেও আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখি যে আমাদের কারখানায় পদোন্নতির ফলে কোনরূপ মোটা একটা খেতাব জোটে না। পদোন্নত ব্যক্তিকে আমরা দেই অধিক বেতন ও অন্য প্রকারের কাজ। মোট কথা আমরা চাই যে, অন্য লোককে যাহারা চালাইবে তাহাদের বাস্তবিক নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

আমাদের প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ ক্রমশঃ প্রমোশন পাইয়া উপরে উঠিয়াছে। আমাদের রুজ নদীতীরস্থ কারখানার ভার যাহার উপর ন্যস্ত, সে ছিল একজন সাধারণ নক্সা তৈয়ারী করিবার মিস্ত্রী। আর একটি বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা প্রথমে ছিল কারখানার ঝাড়ুদার। কারখানার সব কর্ম্মচারীদেরই আমরা প্রথম আমদানী

করিয়াছি একদম রাস্তা হইতে। কারখানার যাহা কিছু করা হয়, অথবা করা হইয়াছে, সবই করিয়াছে আমাদের কারখানার শিক্ষিত লোকেরা। "সকল কাজেরই উন্নতি সম্ভব", এই আদর্শ লইয়া আমরা কাজ করিয়া যাই।

অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও ভাল কাজ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিলে সকল কারখানার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার সমাধান হয়। ব্যয়ের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি না রাখিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি পণ্যোৎপাদনের দিকে নজর বেশী দেয় তাহা হইলে ভাবনা-চিন্তা করিবার কিছু থাকে না। কতকগুলি অপরিহার্য্য খরচ তো হইবেই। তাহার জন্য বৃথা মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? আমাদের বিভিন্ন বিভাগের উপর-ওয়ালারা এবিষয়ে খুব সতর্ক। বাজে বিষয় লইয়া তাহারা বৃথা ছুটাছুটি করে না। আর আমাদের কারখানার ব্যবস্থাও এইরূপ যে, কেহ কাজে একটু গাফিলতি করিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে। কাজই তাহার সফলতা ও সততার মাপকাঠি। কোন ওপরওয়ালা যদি বাস্তবিক কাজের লোক না লইয়া তাহার খাতিরের লোক দ্বারা কারখানা ভরিয়া তোলে তাহা হইলে ধরা পড়িতে তাহার এক মুহূর্ত্তও লাগে না।

যাহারা প্রকৃত উন্নতিকামী এইরূপ লোক খুঁজিয়া লইতে আমাদেরও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কারণ দেখিয়াছি, বেতন অধিক পাইবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই আছে কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণে অনেকেই রাজী নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে শতকরা প্রায় ৯৫ জনের মনের ভাব এইরূপ। বাকী পাঁচ জনের মধ্যেও তিন জন সামান্য কর্ত্তৃত্ব পাইলেই সন্তুষ্ট। আর যে দু'জন থাকে তাহারা প্রকৃত

উন্নতিকামী এবং যে-কোন দায়িত্ব গ্রহণে নারাজ নহে। আমার স্বদেশীয় ইয়াঙ্কিকরা সকলেই উন্নতি চায় কিন্তু গুরু দায়িত্ব লইতে মোটেই রাজী নয়। বিদেশী কর্ম্মচারীরা সামান্য উন্নতিতেই সন্তুষ্ট। কেন এইরূপ হয় বলিতে পারি না। এই সম্বন্ধে দুই একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইবে।

কারখানার কাজে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের সকল কর্ম্মচারীরই আছে। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে আলাদা ব্যবস্থাও করিয়াছি। কতকগুলি ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করায় আমাদের আয়ও হইয়াছে যথেষ্ট। একটু চিন্তাশীল ব্যক্তি হইলেই কর্ম্মচারীরা আমাদের নূতন ব্যবস্থার কথা বলে অথবা পদ্ধতি দেখাইয়া দেয়। বিদেশীদের মধ্যে দেখা যায় পোল্যাণ্ডবাসীরাই এবিষয়ে একটু চটপটে। দুইজন পোল্যাণ্ডবাসী আমাদের কারখানায় দুইটি মূল্যবান যন্ত্র আবিষ্কারে সাহায্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া ছোট খাটো পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আসিয়াছে আরও [illegible]

করি না। আমাদের কারখানার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের কাজ দেখিয়া বুঝিয়াছি যদি কেহ একান্তমনে কোন কাজ করে এবং কাজের উপর যদি তাহার নিষ্ঠা থাকে তাহা হইলে কাজ ছোট হউক বড় হউক সাফল্যের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় না।

কারখানা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা বলিয়া রাখি। যন্ত্রের সাহায্যে বারবার একই রকমে কাজ করাকে অনেকেই ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

আমি নিজেও তাহাই দেখি। আমি নিজে হয়তো ক্রমাগত তিনদিন একটা কাজ এক ভাবে করিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে কি? অধিকাংশ লোকই চায়, তাহাদের কাজের ধরা-বাঁধা নিয়মের যেন কোন রকম ব্যতিক্রম না হয়। তাহারা সেই কাজকেই ভাল মনে করে যেখানে নূতন করিয়া মাথা খাটাইবার প্রয়োজন হয় না। চিন্তা করাটাই তাহাদের কাছে ভয়াবহ বলিয়া মনে হয়। যে কাজে দেহ ও মন দুই-ই নিয়োগ করিবার প্রয়োজন সেই কাজের জন্য লোক পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে।

তারপর ধরা-বাঁধা নিয়মের কথা। কোন্ কাজে বাঁধাবাঁধি একঘেয়ে নিয়ম নাই? ব্যাঙ্ক, স্কুল, আফিস প্রভৃতি সব জায়গাতেই গতানুগতিক প্রথায় কাজ চলিয়া আসিতেছে। তাহা না হইলে কাজ করিয়া উঠা কঠিন হয়। তাই বলিয়া উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি যাহাদের প্রখর তাহারা বাঁধা কাজে বসিয়া থাকিবে কেন? যোগ্য ব্যক্তিদের আদর সর্ব্বত্র রহিয়াছে—কিন্তু অধিকাংশ লোকের নাই যোগ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা। অনেকের আবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও এজন্য যে শ্রমটুকু করা প্রয়োজন তাহা করিবার ইচ্ছা নাই। শুধু হাত পা' গুটাইয়া বসিয়া হাতী-ঘোড়া মারিবার ইচ্ছা থাকিলেই চলিবে কেন? আমরা সর্ব্বদাই চাই এমন লোক যাহারা যন্ত্রশিল্পে নব নব আবিষ্কার দ্বারা পণ্যোৎপাদনে সহায়তা করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিবে। তাহা হইলেই যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে অর্থাগম ও সমাজসেবা দুই-ই হইবে এবং এখানেই উহার প্রকৃত সার্থকতা। এজন্য চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, প্রগাঢ় সততা, অটুট ন্যায়পরায়ণতা এবং আন্তরিক পরোপকার স্পৃহা। যন্ত্রশিল্প যদি এইরূপ কিছু করিতে না

পারে তাহা হইলে ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু আশার কথা, যন্ত্রশিল্পের পূর্ব্ব তোরণে উষার আলোক প্রতিভাত হইয়াছে।

যন্ত্রের কাজ একঘেয়ে বলিয়া কি উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে? তাহা হইলে শ্রমিকের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করিতে হয়। একঘেয়ে কাজ করা অপেক্ষা কি না-খাইয়া মরা ভাল? কোন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিলে কি সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে?

চায়ের টেবিলে, হোটেলে, মজলিসে বহুলোকের কাছে বহুবার শুনিয়াছি, যন্ত্র লইয়া সর্ব্বদা এক ভাবে কাজ করিলে দেহ ও মন উভয়ের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ কিছু দেখি নাই। কারখানায় কাজ করিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেখাইতেছি। একজন লোক বহুদিন পায়ে চালান মেসিনে কাজ করিতেছিল। সে মনে করিল, তাহার একটা দিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল তাহার কোন ক্ষতি-ই হয় নাই। তাহাকে অন্য কাজে বদলি করিয়া দেওয়া গেল, কিন্তু সে দরখাস্ত করিয়া পুনরায় তাহার পুরাতন কাজে ফিরিয়া আসিল। আর একজনকেও একটা একঘেয়ে কাজ হইতে বদলি করিয়াছিলাম, সে সেই কাজে প্রায় আট বৎসর ছিল। কিন্তু বদলির সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার পুরাতন কাজের জন্য ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। একঘেয়ে কাজকে যে লোকে ভয় পায়, অনেক খুঁজিয়াও আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। এবিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি শতকরা ৯৫ জন চাহে গতানুগতিক ভাবে চলিতে।

আমি নিজেও তাহাই দেখি। আমি নিজে হয়তো ক্রমাগত তিনদিন একটা কাজ এক ভাবে করিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে কি? অধিকাংশ লোকই চায়, তাহাদের কাজের ধরা-বাঁধা নিয়মের যেন কোন রকম ব্যতিক্রম না হয়। তাহারা সেই কাজকেই ভাল মনে করে যেখানে নূতন করিয়া মাথা খাটাইবার প্রয়োজন হয় না। চিন্তা করাটাই তাহাদের কাছে ভয়াবহ বলিয়া মনে হয়। যে কাজে দেহ ও মন দুই-ই নিয়োগ করিবার প্রয়োজন সেই কাজের জন্য লোক পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে।

তারপর, ধরা-বাঁধা নিয়মের কথা। কোন্ কাজে বাঁধাবাঁধি একঘেয়ে নিয়ম নাই? ব্যাঙ্ক, স্কুল, আফিস প্রভৃতি সব জায়গাতেই গতানুগতিক প্রথায় কাজ চলিয়া আসিতেছে। তাহা না হইলে কাজ করিয়া উঠা কঠিন হয়। তাই বলিয়া উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি যাহাদের প্রখর তাহারা বাঁধা কাজে বসিয়া থাকিবে কেন? যোগ্য ব্যক্তিদের আদর সর্ব্বত্র রহিয়াছে—কিন্তু অধিকাংশ লোকের নাই যোগ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা। অনেকের আবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও এজন্য যে শ্রমটুকু করা প্রয়োজন তাহা করিবার ইচ্ছা নাই। শুধু হাত পা' গুটাইয়া বসিয়া হাতী-ঘোড়া মারিবার ইচ্ছা থাকিলেই চলিবে কেন? আমরা সর্ব্বদাই চাই এমন লোক যাহারা যন্ত্রশিল্পে নব নব আবিষ্কার দ্বারা পণ্যোৎপাদনে সহায়তা করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিবে। তাহা হইলেই যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে অর্থাগম ও সমাজসেবা দুই-ই হইবে এবং এখানেই উহার প্রকৃত সার্থকতা। এজন্য চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, প্রগাঢ় সততা, অটুট ন্যায়পরায়ণতা এবং আন্তরিক পরোপকার স্পৃহা। যন্ত্রশিল্প যদি এইরূপ কিছু করিতে না

পারে তাহা হইলে ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু আশার কথা, যন্ত্রশিল্পের পূর্ব্ব তোরণে উষার আলোক প্রতিভাত হইয়াছে।

যন্ত্রের কাজ একঘেয়ে বলিয়া কি উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে? তাহা হইলে শ্রমিকের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করিতে হয়। একঘেয়ে কাজ করা অপেক্ষা কি না-খাইয়া মরা ভাল? কোন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিলে কি সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে?

চায়ের টেবিলে, হোটেলে, মজলিসে বহুলোকের কাছে বহুবার শুনিয়াছি, যন্ত্র লইয়া সর্ব্বদা এক ভাবে কাজ করিলে দেহ ও মন উভয়ের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ কিছু দেখি নাই। কারখানায় কাজ করিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেখাইতেছি। একজন লোক বহুদিন পায়ে চালান মেসিনে কাজ করিতেছিল। সে মনে করিল, তাহার একটা দিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল তাহার কোন ক্ষতি-ই হয় নাই। তাহাকে অন্য কাজে বদলি করিয়া দেওয়া গেল, কিন্তু সে দরখাস্ত করিয়া পুনরায় তাহার পুরাতন কাজে ফিরিয়া আসিল। আর একজনকেও একটা একঘেয়ে কাজ হইতে বদলি করিয়াছিলাম, সে সেই কাজে প্রায় আট বৎসর ছিল। কিন্তু বদলির সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার পুরাতন কাজের জন্য ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। একঘেয়ে কাজকে যে লোকে ভয় পায়, অনেক খুঁজিয়াও আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি শতকরা ৯৫ জন চাহে গতানুগতিক ভাবে চলিতে।

অবশ্য যাহারা এইরকম কাজ লইয়া থাকিতে নারাজ তাহাদের জন্যও ফোর্ড কোম্পানীতে যথেষ্ট সুব্যবস্থা রহিয়াছে। কারখানার কাজকে আমরা 'ক', 'খ', 'গ', তিন ভাগে ভাগ করিয়াছি। প্রত্যেক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। নূতন লোককে প্রথমে নিযুক্ত করা হয় 'গ' বিভাগে। সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে প্রমোশন পাইয়া সে 'ক' বিভাগে উঠিতে পারে। 'ক' বিভাগ হইতে প্রমোশন পাইয়া পরিদর্শকের কাজের ভার পায়। কিন্তু প্রমোশন লওয়া না-লওয়া কর্ম্মচারীদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।

১৯১৪ সালের ১২ই জানুয়ারী হইতে নিয়ম করি, আমাদের কারখানায় কাহারও পাঁচ ডলারের নীচে বেতন থাকিবে না এবং প্রতিদিন শ্রমিকদের কাজ করিতে হইবে আট ঘন্টা হিসাবে। সেই সঙ্গে এই নিয়মও করিলাম যে, শারীরিক কোন প্রকার বিকলতার জন্য কাহাকেও কর্ম্মচ্যুত করা হইবে না—অবশ্য ছোঁয়াচে রোগ থাকিলে আলাদা কথা। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে বহু বিকলাঙ্গ কাজ করিতেছে। মজুরী কম দিবার মতলবে কিংবা দয়াপরবশ হইয়া আমরা বিকলাঙ্গদের কাজে নিযুক্ত করি নাই। আমরা দেখাইয়াছি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরাও সাধারণের দানশীলতার উপর নির্ভর না করিয়া, সাধ্যানুসারে কাজ করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারে। নির্ব্বিচারে দান করাটাকে আমি কোন দিন সমর্থন করি না। আমি দেখাইতে চাই, জগতের সর্ব্বত্র বড় বড় কারখানাগুলিতে যদি এই প্রথায় বিকলাঙ্গদের কাজে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের আর পরের ও সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না। আমাদের কারখানায় নিযুক্ত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরাও সুস্থ সবল-দেহ ব্যক্তির ন্যায়ই

কাজ করিয়া থাকে। কারখানার যে কাজের জন্য শরীরের যে অংশের প্রয়োজন, কর্ম্মচারীর তাহা থাকিলেই হইল। কোন কর্ম্মচারীকেই আমরা দান-দাতব্য করি না। ব্যবসার ক্ষেত্রে দান খয়রাতের স্থান থাকিতে পারে না।

কোন্ কাজের জন্য কি প্রকার লোকের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা দেখিবার জন্য আমি কারখানার কাজগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়াছিলাম। দেখা গেল কারখানায় ৭৮৮২ রকমের কাজ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৯৪৯টি কাজের জন্য সুস্থ, সবলকায় ব্যক্তির প্রয়োজন; ৩৩৩৮টি কাজ অতি সাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক দ্বারা চলিতে পারে, বাকী ৩৫৯৫টি কাজ এত সহজ যে তাহার জন্য কোন প্রকার দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। এমন কি স্ত্রীলোক ও ছেলেপেলেরাও তাহা করিতে সক্ষম।

এই সহজ কাজগুলিকেও আবার নানাভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গেল, ৬৭০টি কাজ যাহাদের পা' নাই তাহাদের দ্বারা চলে, যাহাদের এক পা' নাই তাহাদের দ্বারা চলে ২৬৩৭টি কাজ; দু'টি কাজ হস্তহীন লোকেও করিতে পারে; ৭১৫টি কাজ চলে যাহাদের এক হাত আছে তাহাদের দ্বারা এবং ১০টি কাজ অন্ধ ব্যক্তিদের দ্বারাও চালান সম্ভব। এজন্যই বলিয়াছি, সব কারখানাগুলিতে যদি এই ভাবে কার্য্য বিভাগ করা যায় তাহা হইলে বিকলাঙ্গদের পরের গলগ্রহ হইয়া নিরাশ জীবন যাপন করিতে হয় না।

সর্ব্বত্রই দেখি, যাহারা অঙ্গহীন অথবা অন্ধ, কাণা, বোবা, জীবিকার্জ্জনের সুবিধার জন্য তাহাদের বয়ন এবং নানাপ্রকার বাঁশ-

বেতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল কাজে হয়তো কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে কিন্তু জীবিকার্জ্জনের সংস্থান হয় না। ইহা তাহাদের অভিশপ্ত জীবনের বিষণ্ণতা দূর করিবার একটা উপায় মাত্র। বড় বড় কারখানাগুলিতে তাহাদের কাজ করিবার ব্যবস্থা করিলে, তাহাদের ও সমাজের উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও তাহাদের কারখানায় কাজের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। আমরা একবার আমাদের কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করি। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় কারখানায় ৯৫৬৩ জন লোক ছিল কোন-না-কোন রকমে অঙ্গহীন। তন্মধ্যে ১২৩ জনের এক হাত ছিল না, একজন ছিল দুই হাত শূন্য, চার জন অন্ধ, ২০৭ জন কাণা, ২৫৩ জন প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন, ৩৭ জন বোবা-কাণা, ৬০ জন বাতব্যাধিগ্রস্ত, চার জন দুই পা' এবং ২৩৪ জন এক পা' হীন। বাকী ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য ত্রুটী ছিল। ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাজের জন্য একটা আলাদা ঘর রহিয়াছে। তাহাদের বেশীর ভাগ কাজ করিতে দেওয়া হয় ঘরের বাহিরে। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীও কারখানায় আছে প্রায় এক হাজার।

আমাদের নিয়োগ-বিভাগ নূতন লোককে কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহার শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাহার হাতে কাজ দেয়; সেখানে না পারিলে অন্যত্র বদলি করা হয়। শ্রমিকদের সামর্থ্য অনুসারে কাজে নিযুক্ত করিয়া আমাদের লাভ হইয়াছে যথেষ্ট। শুধু এখানেই শেষ নয়। রোগে অথবা কোন প্রকার আঘাত পাইয়া যাহারা শয্যাশায়ী হয় তাহাদের অবশ্য আমরা একটা ভাতা দিয়া থাকি। কিন্তু ভাতা কখনও বেতনের সমান হয় না। এজন্য ইহার একটা

প্রতিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকল রোগেরই একটা আরোগ্যের সময় আছে; সে সময় রোগী হয়তো চিকিৎসাধীনই থাকে এবং বিশেষ নড়া-চড়া করিতে পারে না। কিন্তু তখন সাধারণ কাজ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা তাহার হয়। সেই সময় কারখানা হইতে তাহাদের খুব সহজ কাজ দেওয়া হইয়া থাকে। এজন্য পূর্ণ মজুরী তাহারা পায়। অবশ্য রোগীর অনিচ্ছা থাকিলে আমরা কখনও কোন কাজ দেই না। কিন্তু কাজ করিবার অনিচ্ছা এখন পর্য্যন্ত আমাদের কারখানার কোন রোগীর দেখি নাই।

ফোর্ড কোম্পানীর নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা খুব কড়া রকমের। প্রত্যেক কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধ্য। তাহা ছাড়াও আমাদের কোম্পানী এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, এক জনের কাজে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে একসঙ্গে বহুলোকের অসুবিধা হয়। এজন্য খুব কড়া নিয়ম-কানুন না থাকিলে আমাদের চলে না। কোন কোম্পানীর তাহা না-থাকা উচিত নহে। আমরা কারখানার লোকদের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ আদায় করিয়া লই এবং বেতনও দেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার পরও যদি এমন কেহ থাকে যে কোম্পানীর নিয়ম মানিয়া কাজ করিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে আমরা রাখি না। কাজে আসা-না-আসা সম্বন্ধে আমাদের আইন খুব কড়া। ছুটী লইতে হইলে আগেই দরখাস্ত করিতে হয়। যদি বিশেষ কোন কারণে কেহ দরখাস্ত না করিয়াই আফিস বা কারখানায় অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে কৈফিয়ৎ পেশ করিতে হয় কিংবা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হয়। আমরা চাই যে, কোন সন্তোষজনক কারণ না থাকিলে কেহ আফিস কামাই করিবে না।

শ্রমিকদের উপর কড়া শাসন রাখে বলিয়া ফোর্ড কোম্পানী তাহাদের উপর কখনও অন্যায় করে না। ওপরওয়ালাদের দুর্ব্বলতা বশতঃ কোন সময় কিছু অন্যায় হইয়া গেলেও আমরা যথাসম্ভব তাহার প্রতিকার করি। শ্রমিকদেরও এবিষয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনিবার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় আমাদের যন্ত্রপাতি খুব ঘন ঘন স্থাপিত থাকিলেও সর্ব্বদা শ্রমিকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যন্ত্রগুলি বসাইয়াছি। যন্ত্র যাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, সেই চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। কারখানার ঘরগুলিকে স্বাস্থ্যকর রাখিবার জন্য যতটা সম্ভব আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহু লোকে একসঙ্গে কাজ করে বলিয়া ঘর হইতে দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিবার জন্য পাম্প বসান আছে। কারখানা পরিষ্কার করিবার জন্য অন্যূন সাতশত লোক সর্ব্বদার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। এজন্য কারখানা ঘরে কিংবা দরজা জানালায় এক বিন্দু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন পর্য্যন্ত আমাদের এখানে কেহ দেখে নাই। কারখানার কাজের সময় যাহাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তজ্জন্য আমরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকি। শ্রমিকদের মানসিক অবসাদ অশান্তি নিবারণের জন্য বেতনও দেই আমরা যথেষ্ট। দেখা গিয়াছে, মানসিক অবসাদও অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রমিকদের বেতন সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

—সাত—

কোন কারখানা অথবা কোন প্রকার যন্ত্রশিল্পের কথা বলিতে গেলে শ্রমিকদের বেতনের হারের কথা হয় প্রধান বক্তব্য। এই বেতনের উপরই দেশের অধিকাংশ লোক নির্ভর করে; তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় দেশের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ। শ্রমিকদের বেতনের হার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপণের প্রধান মাপকাঠি। কারখানায় কাজ করিয়া যদি শ্রমিকদের অন্নবস্ত্র, সুখ-সুবিধা, আমোদ-প্রমোদের সংস্থানই না হইল তাহা হইলে সেই রকম কাজ করিয়া লাভ কি, এবং কারখানা রাখিবারই বা সার্থকতা কোথায়?

আমাদের নূতন নিয়ম অনুসারে ফোর্ড কোম্পানীর শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী দেওয়া হয় ছয় ডলার হিসাবে। ১৯১৪ সালে দিতাম পাঁচ ডলার, ইহারও পূর্ব্বে দেওয়া হইত প্রয়োজন বুঝিয়া। কারখানা পরিচালনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছি যে পূর্ব্বের হারে বেতন দেওয়া ভুল হইত। বাজারের চলতি হিসাবে বেতন দেওয়ার নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রমিকদের বেতনের হারের কথা বলিতে হইলে সঙ্গে অনেক কথা উঠিয়া পড়ে। সেগুলি সবই এক এক করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমে শ্রমিক ও ধনিকের সম্পর্কের কথা ধরা যাক্। ধনিক ও কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ শ্রমিকদের কখনও ব্যবসায় অংশীদার বলিয়া মনে করিতে চাহে না। কিন্তু বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদের আর কি বলা চলে? যখন কেহ কোন কাজ একাকী করিয়া উঠিতে পারে না তখনই অপর লোকের তাহাদের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে অংশীদার বলা হইবে না কেন? শ্রমিক কার্য্যে তাহার উপর ন্যস্ত অংশ সম্পন্ন করিয়া কাজটিকে পূর্ণতা প্রদানে সাহায্য করে; অতএব কাজে তাহার একটা অংশ রহিয়াছে। কিন্তু লাভের বেলায় তাহাকে বঞ্চিত করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে যে ব্যবসায়ে একজনের অধিক লোককে খাটিতে হয় উহাকেই যৌথ বা অংশীদারী কারবার বলা চলে। যখন কোন কারখানার সত্ত্বাধিকারী বা পরিচালক পণ্যোৎপাদনে কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করে তখনই সে উহাকে নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে। অপরের সাহায্যের উপর যতদিন কোন ব্যক্তিকে নির্ভর করিতে হয় ততদিন তাহাকে স্বাধীন বলা চলে না। ধনিক ও শ্রমিক তেমন কেহই স্বাধীন নহে। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে। উভয়েই উভয়ের নিকট অপরিহার্য্য। ধনিক শ্রমিকের অংশীদার এবং শ্রমিক ধনিকের অংশীদার। এক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি করাই ভুল। এই রেষারেষির ফলে লাভ কোন পক্ষেরই হয় না, মাঝখানে শুধু ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নেতা অথবা ব্যবসার পরিচালক হিসাবে ধনিকের উচিত সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কি করিয়া শ্রমিকদের অধিকতর মজুরী দেওয়া যায়;

শ্রমিকদের সেইরূপ দেখা উচিত কি করিয়া কাজ আরও ভাল হয়। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়, শ্রমিকেরা মনে করে বেশী খাটিয়া তাহাদের লাভ কি? তাহাদের শ্রমের ফল তো ভোগ করিবে শুধু ধনিক। এইরূপ মনে করিবার কারণও আছে। অনেক সময় তাহারা খাটিয়া দেখিয়াছে যে, খাটুনির পুরস্কার তাহাদের মিলে না। কিন্তু একবার যদি তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহাদের পরিশ্রমের পুরস্কার আছে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই কারখানাকে ক্রমশঃ উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রমিকদের বেতনের হার কিরূপ হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে তেমন বলা যায়, ব্যবসার আয় বুঝিয়া শ্রমিকদের বেতন দেও। আয়ের অধিক ব্যয় হইলে ব্যবসাই বা চলিবে কি প্রকারে? আয়ের অধিক ব্যয় হইলে কোন ব্যবসা চলিতে পারে না। আজ হউক কাল হউক উহা গুটাইতেই হইবে। শ্রমিকদের বেতনের হার কারবার নিজেই ঠিক করিয়া লইবে।

"ধনিকের এইরূপ করা উচিত", এই কথা না বলিয়া শ্রমিক যদি বলে, "এই ভাবে কাজ করিলে ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে", তাহা হইলেই সব গোল চুকিয়া যায়। ব্যবসায়ের উপরই শ্রমিকদের বেতনের হার নির্ভর করে। ব্যবসার উন্নতি না হইলে ধনিকই বা বেতন যোগাইবে কোথা হইতে? আবার এদিকে ব্যবসায় লাভ হইলে শ্রমিকদের ন্যায্য হারে বেতন না দেওয়াও গর্হিত অপরাধ। ন্যায্য প্রাপ্য হইতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হইলে শুধু তাহাদেরই প্রতি অন্যায় করা হয় না—তাহাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গের প্রতিও অন্যায় করা হয়। ধনিক যদি চেষ্টা করে শ্রমিককে ঠকাইতে

এবং শ্রমিক চেষ্টা করে ধনিকের নিকট হইতে 'যেন তেন প্রকারেণ' বেশী আদায় করিতে, তাহাতেও কোন লাভ হয় না। সকলেরই উচিত ব্যবসাকে দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা। কারণ, ব্যবসাটা ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র বিশেষ। যেখানে উভয়ে এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কাজ করিতে থাকে সেখানে সাফল্য সুনিশ্চিত। শ্রমিকদের বেতন তাহারা নিজেরাই যোগায়। তাহাদের কাজের উপরই নির্ভর করে কোম্পানীর লাভালাভ, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি। যাহারা কাজ করিবে বেশী তাহারা পাইবে বেশী; ইহাই সরল সত্য। অতএব, শ্রমিকদের অধিক বেতন দেওয়ার মধ্যে বদান্যতা বা দানশীলতার কিছু নাই। যে শ্রমিক কাজ করিয়াও স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিতে না পারে তাহার পক্ষে অধিক কাজ করাও অসম্ভব। চিন্তা ভাবনার দুঃসহ বোঝা ঘাড়ে লইয়া কেহ কোন কাজে মন বসাইতে পারে কি ?

শ্রমিক যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার কাজ হইতেই পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন, সুখ-সম্পদ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হইতেছে এবং ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্য দু'টী পয়সা সঞ্চয় করিতে পারিতেছে, তাহা হইলে আপনা হইতেই সে কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবে। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না। ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ী উভয়ের পক্ষেই এই জিনিষটা ভাল নয় কি ? বৎসরের শেষে হিসাব খতাইয়া যদি দেখা যায় যে, শ্রমিকদের ভাগে আরও কিছু দেওয়া চলে তাহা হইলে তাহা দেওয়াই উচিত। কারণ অংশীদার হিসাবে লাভের অংশ তাহাদেরও প্রাপ্য। আমার কথা, ব্যবসার বাজারে এই নীতির প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীকার করিয়া

লইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকদের বেতনের হার নির্দ্ধারিত হইবে এই প্রণালীতেই।

সম্প্রতি সমাজে রব উঠিয়াছে যে, ব্যবসায়ে বেচাকেনার যেমন একটা দিক আছে, সেইরূপ শ্রমিকদের "মনুষত্ব" বলিয়াও আর একটা দিক রহিয়াছে। এই "মনুষত্বের" ভাব ক্রমে সকলের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। অচিরে যে ইহা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরাও ইহাকে বাধা দিতে চাই না। ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষের মনুষত্বের দিকটা আরও ফুটিয়া উঠুক্ ইহাই আমাদের ইচ্ছা। শ্রমিকদের মনুষত্বের দিকটা বড় করিয়া দেখা তেমন কঠিন ব্যাপারও নয়। ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি না করিয়া, শ্রমিক ও ধনিকের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া অনায়াসেই ইহা বজায় রাখা যাইতে পারে। শ্রমিকদের ব্যবসায়ের অংশীদার বলিয়া স্বীকার করাই ইহার একমাত্র উপায়। বেতন ও মজুরীর হার সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। প্রকৃত পক্ষে বেতনের হার নির্দ্ধারণ করা অংশীদারদের মধ্যে লাভের অংশ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, কাজের জন্য লাভের কতটা অংশ শ্রমিকদের প্রাপ্য অথবা কি হারে বেতন দিলে তাহাদের ঠিক দেওয়া হয়? তাহাদের নিতান্ত খাওয়া থাকার খরচ দেখিয়া বেতনের হার নির্দ্ধারণ করা চলে না, কারণ খাওয়া-থাকার খরচ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন সীমা-রেখা টানা চলে না। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জীবনযাত্রার জন্য মানুষের ব্যয় তাহার পরিশ্রমের ফল ছাড়া কিছুই নয়। অতএব গোড়া ছাড়িয়া মাথার দিকে চাওয়া

অনেকটা ছায়ার পিছনে ছুটিবার মত। অধিক শ্রম করিলে অধিক বেতন পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। পরিশ্রমকে উহার ন্যায্য প্রাপ্য দিতেই হইবে। কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার। তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে, শ্রমিকের নিকট মজুরী কি এবং তাহা কি পরিমাণ হওয়া উচিত।

শ্রমিকের বেতনের সম্পর্ক শুধু তাহার কারখানা বা কারখানার মালিকের সহিত নহে। কারখানার বাহিরে যে জগৎ আছে, কাজের পর যে বিশ্রামের সময় আছে উহার সহিত বেতনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শ্রমিকের নিকট তাহার বেতন অন্ধের যষ্টী, নিঃসম্বলের সম্বল, দুঃসময়ের বন্ধু। বার্দ্ধক্য ও জরা যখন তাহার কর্ম্মক্ষমতাকে নিঃশেষ করিয়া লইবে, সেই দুর্দ্দিনের সংস্থানও করিতে হইবে তাহাকে এই বেতন হইতে। বেতন নির্দ্ধারণে এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিতে হইলে দেখিতে হইবে বাস্তবিক পণ্যোৎপাদনে যাহারা কোন প্রকার সহায়তা না করে তাহাদের পকেটে যেন লাভের অংশ বেশী না যায়। এখানেই সমস্যার শেষ নয়। শ্রমিকের বাস্তব জীবনের দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শ্রমিক তাহার সংসারে যদি একাকী হইত তাহা হইলে মজুরী নির্দ্ধারণে কোন বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু সংসারে সে একা নয়। জাতির নিকট সে একজন নাগরিক, অন্যান্য নাগরিকের ন্যায় জাতির প্রতি তাহারও একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে। গৃহে সে পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী। পরিবারের প্রতি গৃহস্বামীর যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে সবই তাহাকে পালন করিতে হয়। কারখানার মালিকদের এই সকল দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রমিক যখন কারখানার কাজে ব্যস্ত, তাহার পত্নী তখন গৃহে থাকিয়া

তাহারই সংসার চালায়। শ্রমিকের পত্নী তাহার কাজে সহায় স্বরূপ। পত্নী সংসারের কাজকর্ম্ম দেখে বলিয়াই শ্রমিক নিজে কারখানার কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে এবং এই কাজ হইতে তাহার যে আয় হয় তাহাই সংসার চালাইবার পক্ষে তাহার একমাত্র অবলম্বন। কারখানার কাজ শ্রমিকের নিকট সমস্ত উপার্জ্জনের উৎস। এজন্য কারখানার শ্রমিক ও তাহার পত্নী উভয়কে বেতন দিতে হইবে। অবশ্য তাহার পত্নীর বেতন দিতে হইবে পরোক্ষে শ্রমিকের কাজের মারফতে। কোম্পানীর মালিক হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, শ্রমিকের বেতন নির্দ্ধারণ করিবার সময় কি তাহার পরিবারের সমস্ত ব্যয় এবং বার্দ্ধক্যের সংস্থানের কথা ভাবিতে হইবে? উত্তরে আমি বলিব, "নিশ্চয়"। তাহা না হইলে শ্রমিক দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, এমন কি কারখানার প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইবে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে কোম্পানী শ্রমিকদের বেতন যত বেশী দিক না কেন প্রকৃত পক্ষে যাহা দেওয়া উচিত আজ পর্য্যন্ত ততদূর পৌছিতে পারে নাই। সুব্যবস্থার শিখরে পৌছিতে আমাদের এখনও অনেক বাকী। এই কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ করিতেই হইবে। তাই বলিয়া বেতনের প্রথা উঠাইয়া দিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রথার প্রচলন করিলে চলিবে না। শ্রমিকদের কাজের একমাত্র পুরস্কার হইতে পারে বেতন। বেতনের প্রথা উঠাইয়া দিলে শ্রমিকদের প্রতি করা হয় ঘোরতর অন্যায়।

বহুদিন দেখিয়া শ্রমিকদের বেতন সম্বন্ধে আমার অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে মনে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের

শ্রমিকদের বেতনের হারের উপরই ফোর্ড কোম্পানীর জিনিষপত্র বিক্রয় অনেকটা নির্ভর করে। আমরা যদি শ্রমিকদের বেতন বেশী দেই তাহা হইলে এই টাকাটা বাজারে অনেকদূর ছড়াইয়া পড়িবে এবং পরে আমাদের পণ্যের উপরই উহার ফল প্রতিফলিত হইবে। সর্ব্বত্র উচ্চহারে বেতন দেওয়ার অর্থই দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা।

প্রথম দিকে আমরাও শ্রমিকদের বেতনের হার সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের "টি" মডেলের গাড়ী বাজারে চলিবার পর এবিষয় অনেকটা ঠিক হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আমরা বৎসরের শেষে লাভের একটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিতাম। তাহারা ইহাকে তাহাদের প্রাপ্য বলিয়া মনে না করিয়া কতকটা পুরস্কার বা "বোনাস" বলিয়া মনে করিত। এই অতিরিক্ত দেওয়ার সঙ্গে কতকটা বদান্যতার অবাঞ্ছনীয় গন্ধ মাখান ছিল। কিন্তু ১৯১৩ সালের পর কারখানার প্রত্যেকটি কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া এবং কোন্ কাজে কতটা পারদর্শীতার প্রয়োজন তাহা দেখিয়া বিভিন্ন বিভাগের বেতনের হার ঠিক করিয়াছি। ১৯১৪ সালে ফোর্ড কোম্পানীতে ঘোষণা করা হয় যে, কোম্পানীর শ্রমিকদের ন্যূনতম হারে বেতন হইবে দৈনিক পাঁচ ডলার এবং দৈনিক কাজ করিতে হইবে আট ঘণ্টা। পূর্ব্বে কাজের সময় ছিল দৈনিক নয় ঘণ্টা। আমরা স্বেচ্ছায় উক্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম এবং ইহাতে সমাজের কল্যাণ হইল মনে করিয়া কতকটা আত্মতৃপ্তিও পাইয়াছিলাম। অপরকে সুখী করিবার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ রহিয়াছে। সদিচ্ছা, শুভকামনা মানুষের

জীবনের একটা সম্পদ বিশেষ। দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া মানুষ অনেক কিছুই করিতে পারে, কিন্তু তাহার সফলতার মধ্যে যদি অপরের শুভাশীষ বর্ষিত না হয় তাহা হইলে প্রকৃত লাভের অনেকটাই বাকী থাকিয়া যায়।

নিজেদের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য আমরা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করি নাই। কিন্তু অনেকেই আমাদের ঘোষণার অর্থ বিকৃত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল, আমাদের নাকি টাকা বেশী হইয়াছে, কেহ বা বলিল যে, আমরা বাজারের চল্‌তি নিয়ম উঠাইয়া দিয়া অন্যায় করিতেছি। কিন্তু সত্য বলিতে, কোন প্রকার চল্‌তি প্রথা ভাঙ্গিবার আমাদের কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। ব্যবসাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই আমরা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমাদের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে। আমি জানিতাম বেতন নির্দ্ধারণের ব্যাপারে চল্‌তি প্রথা বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না। থাকিলেও, আজ হউক, কাল হউক তাহা ভাঙ্গিবেই। নতুবা দেশের দারিদ্র্য দূর হওয়া অসম্ভব। আমাদের ঘোষণা বাস্তবিকই ব্যবসা-জগতে একটা নূতন আন্দোলন সৃষ্টি করিল। কিন্তু ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা অনেকেই ধরিয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিবার অর্থ এই যে, লাভের যে অংশটা বৎসরের শেষে তাহাদের ভাগ করিয়া দিতাম মোটামুটি আন্দাজ করিয়া পূর্ব্বেই তাহাদের সেই অংশটা দিয়া দেওয়া। কিন্তু এই দেওয়ার মধ্যেও কতকগুলি সর্ত্ত ছিল। অন্যূন ছয় মাসের উপর যাহারা আমাদের কোম্পানীতে কাজ করিয়াছে তাহারাই নূতন হারে বেতন পাইবার অধিকারী

ছিল। নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম, যে সকল লোক বিবাহিত ও মিতব্যয়ী এবং যে সকল স্ত্রীলোক আমাদের কোম্পানীতে কাজ করিয়াই সংসার চালায় তাহাদেরই বর্দ্ধিত হারে বেতন দেওয়া হইবে। তখনকার বাজার চল্‌তি বেতন অপেক্ষা আমাদের কারখানার বেতনের হার ছিল শতকরা পনের ডলার হিসাবে বেশী। আমাদের সমৃদ্ধি আমাদের সহকর্ম্মীরাও ভোগ করুক ইহাই ছিল আমাদের কাম্য।

শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখে সেদিকেও আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। আমরা দেখিয়াছি, যাহারা থাকে ভাল তাহারা কাজকর্ম্মও করে ভাল। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিবার জন্য আমাদের কোম্পানীতে 'সমাজ সেবক বিভাগ' বলিয়া একটা বিভাগ ছিল। ইহার ফলে কর্ম্মচারীদের উপর কোম্পানী অনেকটা অভিভাবকত্ব চালাইত। কিন্তু গোড়াতে এরকম কোন অভিসন্ধি ছিল না। আপনা হইতেই যেন এই ভাবটা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাহারা বিবাহিত তাহারা যাহাতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকে, বাড়ীতে বোর্ডার রাখিয়া যাহাতে বাড়ীকে বোর্ডিং হাউসের রূপান্তর করিয়া না তোলে সেদিকে আমাদের খুব লক্ষ্য ছিল।

শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ফলে এই হইয়াছিল যে, ছয় মাসের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ জন কর্ম্মচারী কোম্পানীতে অংশ কিনিয়াছিল এবং কোম্পানীর কাজের জন্য আর বাহিরে নূতন লোকের সন্ধান করিতে হয় নাই। আমাদের কাজ যখন খুব বাড়িয়া গেল তখনও নূতন লোকের অভাবে আমরা কোন অসুবিধা ভোগ করি নাই। ১৯১৪ সালে কারখানায় প্রয়োজন হইত দৈনিক ১৪০০০ শ্রমিকের।

এই জন্য বৎসরে আমাদের কারখানায় ৫৩০০০ লোক কাজ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির পর ১৯১৫ সালে সাড়ে ছয় হাজার নূতন লোক মাত্র বাহির হইতে আনিতে হইয়াছিল। এখন আনিতে হয় তাহারও অর্দ্ধেক। বেতন বৃদ্ধি না করিয়া আমরা যদি পূর্ব্বের ন্যায় নূতন লোক দিয়া কাজ চালাইতাম তাহা হইলে বর্ত্তমান কাজের জন্য বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ লোক আমদানী করিতে হইত এবং এত লোক পাওয়া হইত অসম্ভব; এখন সেই দুর্ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।

সাধারণ কথায় যাহাকে চল্‌তি প্রথা বলে বেতন বৃদ্ধি করিয়া সেই প্রথার পরিবর্ত্তন করিলেও ব্যবসায়ের মূল নীতি হইতে একচুলও আমরা এদিকে-ওদিকে যাই নাই। কোন লোকের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ আদায় করিতে হইলে তাহাকে সংসারের অভাব অনটনের সমস্ত চিন্তাভাবনা হইতে দূরে রাখিতে হইবে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রমিকের বেতন ধার্য্য করিতে হইবে। বেতন বৃদ্ধি করিয়াও শ্রমিকদের 'বোনাস' দিয়া দেখিয়াছি ব্যবসাকে লাভ-জনক করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

—আট—

ব্যবসায়ের সহিত শ্রমিকদের বেতনের কি সম্পর্ক তাহা বলিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের নীতির কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু বেতন ছাড়াও ব্যবসায়ের ভাল-মন্দের আর একটা দিক আছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্যবসায়ের বাজারে দেখা যায় কোন সময়ে কারখানার কাজ খুব পুরাদমে চলে কোন সময়ে বা কারখানা প্রায় বন্ধ থাকে। ঠিক একভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে এরকম কোম্পানী খুবই বিরল। কারখানায় কাজ চলা, না-চলার দিকে চাহিয়া ব্যবসায়ীরা ব্যবসার অবস্থাকে ভাল বা মন্দ বলিয়া থাকে। যখন বাজারে উৎপন্ন পণ্যের খুব বেচাকেনা চলে তখন বলা হয় বাজার ভাল, আবার যখন বাজারে বেচাকেনা বন্ধ হইয়া যায় তখন বলা হয় বাজার মন্দা। কিন্তু বাজারে মালের চাহিদা থাকে না এইরূপ সময় কখনও আসিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। কোন সময় হয়তো কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য কোন কারণে খারাপ হইয়া যায় এবং সেই জন্য বাজারে কাটতি কম হয়। তাই বলিয়া এই অবস্থাকে 'চাহিদা নাই' বা বাজার মন্দা বলা চলে না। ইহাতে নিজেদের দোষ বাজারের ঘাড়ে

চাপাইয়া দিয়া কাজের গাফিলতির প্রতি চোখ ঠার দেওয়া হয় মাত্র। পণ্যোৎপাদনে কারখানার মালিকদের এই ত্রুটি তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শীতারই পরিচায়ক। নির্ব্বোধের মত না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, জিনিষ ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহার দিকে না তাকাইয়া পণ্য তৈয়ারী করিলে বাজারে কাটৃতি কম হইবেই। ইহাকে চাহিদা নাই বলা ভুল। দেখিয়া শুনিয়া ক্রেতা খারাপ জিনিষ কিনিবে, কোন ব্যবসায়ীর এইরূপ মনে করা ঘোরতর অন্যায়।

ব্যবসাকে ভাল মন্দ করিয়া গড়িয়া তোলা নির্ভর করে ব্যবসায়ীর নিজের উপর। কারখানায় যে পণ্যই উৎপাদন করা হউক না কেন ক্রেতার ব্যবহারের জন্যই তাহা করা হয়। পণ্যোৎপাদনের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় ব্যবসায়ীরা পণ্যোৎপাদনের প্রধান হেতু ও উদ্দেশ্যকে পেছনে রাখিয়া অধিক লাভের আশায় অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া জিনিষ তৈয়ারী করিয়া যায়। তাহাদের লক্ষ্য থাকে শুধু টাকার দিকে। এজন্যই বাজারে হয় যত গোলমাল। পণ্যোৎপাদনে এই ভুলের জন্যই ব্যবসায়ীরা এত দুঃখ ভোগ করে, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাহাদের এত অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। কারবারের এই অবস্থাকে বলা চলে সুব্যবস্থার অভাব।

দেখিয়াছি, ক্ষেত্রে একবার ফসল না হইলে দেশময় দুর্ভিক্ষের হাহাকার রব উঠে। কিন্তু পণ্যোৎপাদনের ক্ষমতা মানুষের হাতের মুঠোতে থাকা সত্ত্বেও লোকে দুর্ভিক্ষের তাড়না সহ্য করিবে কেন বুঝিনা। অবশ্য দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের ন্যায় অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইলে কথা আলাদা হয়। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে একথাও বলা চলে যে, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই

যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে। এজন্য যুদ্ধকে দোষ দেওয়া চলে না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহা দেখা গিয়াছে। তখন আরও বুঝা গিয়াছে যে, ব্যবসায়কে শুধু টাকার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলা হয় বলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। এই গতানুগতিক ধারা পরিবর্ত্তন না করিলে জগতে কখনও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে না। অর্থনৈতিক জগতে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আজ হউক, দু'দিন পরে হউক ঘটিবেই।

বাজারের সাময়িক 'মন্দা' দেখিয়া অনেক সময় মনে হয়, ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। এই ধারণা খুবই ভুল। বাজার মন্দা বন্ধ করিতে হইলে অবশ্য সমস্ত ব্যবসা জগতের পুনর্গঠন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই বলিয়া বসিয়া না থাকিয়া যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যবসায়ের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে ব্যবসা জগতের প্রভূত উপকার করা সম্ভব হয়। ফোর্ড কোম্পানীর পক্ষে বাজার ভাল-মন্দ বলিয়া কোন সময় আসে নাই, সকল সময় সমান ভাবেই উহার কাজ চলিয়াছে। শুধু ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ পর্য্যন্ত কারখানায় যুদ্ধের জন্য সরঞ্জাম তৈয়ারী করা হইত বলিয়া আমাদের পণ্যোৎপাদন কম হইত। ১৯১২-১৩ সালে নাকি দুনিয়ার বাজারে মন্দা পড়িয়াছিল, কিন্তু তখন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আমার মোটর দ্বিগুণ বিক্রয় করিয়াছিলাম। ১৯১৪ সালে বাজার ততোধিক মন্দা ছিল বলিয়া শুনিয়াছি; সেই বৎসর আমাদের গাড়ী বিক্রয় হইল আরও বেশী। ১৯২০-২১ সালে বাজারের অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে ইতিহাসে সে রকম দুর্ব্বৎসরের কথা নাকি আর উল্লেখ নাই। সেই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বৎসরে আমরা মোটর বিক্রয় করিয়াছিলাম সাড়ে বার লক্ষ।

কোন প্রকার যাদুবিদ্যার বলে আমরা এই অঘটন সংঘটন করি নাই। আমাদের অনুসৃত নীতি অনুসারে কাজ করিলে সকলেই এইরূপ করিতে পারে।

আমরা শ্রমিকদের এমন হারে বেতন দেই যে, তাহাদের কাজের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হয় না। তাহা ছাড়া বাজারে চমক লাগাইবার প্রথা আমাদের নাই। চমক লাগাইয়া ব্যবসার উন্নতি করা যায় না। ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে খুব ভাবিয়া চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ব্যবসায়ীকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সে সমাজের সেবক মাত্র। সকলের সুবিধার জন্য যথা সম্ভব অল্প মূল্যে ভাল জিনিষ বাজারে দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য। শ্রমিকদেরও তাহার যথাসম্ভব অধিক বেতন দিতে হইবে। দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের কোন সার্থকতা নাই। দেশে যখন খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের অর্থের অভাব হইবে না তখনই বুঝা যাইবে দেশ সমৃদ্ধ। ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের অঙ্কের সহিত দেশের সমৃদ্ধির সম্পর্ক খুব কম।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোন পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে ব্যবসায়ী প্রথম হিসাব করে উৎপাদনের ব্যয় এবং পরে নির্দ্ধারণ করে উহার মূল্য। কিন্তু ক্রেতা যদি পণ্য ক্রয় করিতে না চায় অথবা পণ্য ক্রয় করিবার মত ক্ষমতা তাহার না থাকে তাহা হইলে ব্যবসায়ী দোষ দেয় ক্রেতার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদোষ কাহার? ক্রেতার না বিক্রেতার? ক্রেতার হাতে জিনিষ পৌঁছাইয়া দিতে না পারিলে ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ। সস্তা দামে যদি ভাল জিনিষ

ক্রেতার হাতে দেওয়া যায় তাহা হইলে যে-কোন জিনিষের ব্যবসায় সাফল্যের চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে। ইহা ছাড়া ব্যবসায়ে উন্নতির দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পণ্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য দেখিয়াছি প্রথমেই হাত দেওয়া হয় শ্রমিকদের বেতনের উপর। ইহার অর্থ শুধু এই যে, পরিচালকের অক্ষমতার জন্য যে ত্রুটি হয়, উহার দোষ চাপাইয়া দেওয়া হয় শ্রমিকদের উপর; যেন শ্রমিকদের বেতনই জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির কারণ। ব্যবসার মন্দার সময়ই হয় ব্যবসার পরিচালকের বিচক্ষণতার প্রধান পরীক্ষা, তখনই পাওয়া যায় তাহার কর্ম্মক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই অগ্নিপরীক্ষার সময় শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া কারখানার অধ্যক্ষ প্রকৃত সমস্যা এড়াইয়া চলে মাত্র।' আসল গলদ কোথায় তাহা ধরিতে পারিলে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করিবার কখনও প্রয়োজন হয় না। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। বাজার মন্দার সময় কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিলেই চলে। ক্ষতির অর্থে নূতন করিয়া টাকা ঢালা নয়, ভবিষ্যতের লাভের আশায় আপাতঃ লাভের টাকা কতকটা ছাড়িয়া দেওয়া। ইহাতে সমাজ ও দেশের কাজ ব্যবসায়ীর কার্য্য পরিচালনার দোষে বন্ধ থাকে না। আমাদেরও একবার এই রকম ক্ষতি দিতে হইয়াছিল। দুনিয়ার বাজারে যখন মন্দা পড়িল, তখন সে ঢেউ ফোর্ড কোম্পানীর দরজায় আসিয়াও লাগিল। দেখিলাম আমাদের গাড়ীর তখন যে মূল্য ছিল, সেই মূল্যে উহা বিক্রয় হইবে না, অথচ মূল্য কমাইতে গেলেও যথেষ্ট ক্ষতি দিতে হয়; তাই বলিয়া কাজ বন্ধ করিলে চলিবে না। ক্রেতাদের সুবিধামত দরে তাহাদের হাতে জিনিষ দিবার জন্য 'আমরা

এক কোটি সত্তর লক্ষ ডলার ক্ষতি দিতে রাজী হইলাম। তবু ব্যবসা চলিল, কারখানার কাজ বন্ধ হইল না।

ব্যবসা চালাইতে হইলে এই প্রথা অবলম্বন করিতেই হইবে। হয় সাময়িক ক্ষতি দিয়া ব্যবসার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, না হয় কুড়েমি করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া ক্ষতি ভোগ করিতে হইবে। ক্ষতি দিতে হইলে বোধ হয় কাজ করিয়া ক্ষতি দেওয়াই ভাল। নচেৎ একবার কুড়েমিতে পাইয়া বসিলে নূতন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। দেশের অবস্থা যতই খারাপ হউক না কেন, একটা অবস্থা লোকের সর্ব্বদাই থাকে, যখন সে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য ন্যূনতম একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য পর্যন্ত দিতে সক্ষম হয়। বাজার মন্দার সময় ব্যবসায়ীকে তাহার জিনিষের মূল্য সেখানে নামাইতে হইবে।

মানুষই দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা তৈয়ারী করে, অর্থ নৈতিক অবস্থা কখনও মানুষকে তৈয়ারী করে না। যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে সেখানে বুঝিতে হইবে গোড়ায় অনেক গলদ রহিয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে মানুষের চিন্তাশক্তির একটা ধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সামাজিক ও ব্যবসায়-জীবনে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে তাহাতে আমাদের নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকটিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিক তাহা অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ ইচ্ছা করিয়া অর্থ নৈতিক ও আর্থিক অবস্থাকে এইরূপ ভাবে গড়িয়া তোলে নাই। মানুষের অজ্ঞাতে, মানুষের অলক্ষ্যে তদানীন্তন প্রয়োজনানুসারে ইহা ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে। তখন হয়তো সকলেই নূতন পদ্ধতিকে খুব

ভাল বলিত। কিন্তু সাফল্যের বিষময় ফলের কথা তখন কাহারও মনে ঘা' দিয়াছে কি? শ্রমিক ও ধনিকে যে কালে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবে তাহা কেহ ভাবিতে পারিয়াছে কি? ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শ্রমিকদের পদানত করিয়া রাখিবার প্রথা কেহ ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয়ই করে নাই। শ্রমিক আপনা হইতেই কারখানার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমতঃ লাভের জন্য ব্যবসার সূত্রপাত হইলেও পরে বুঝা গিয়াছে যে, সমাজ সেবাই ব্যবসার উদ্দেশ্য। বহু স্বার্থ, বহু ব্যাপারের সহিত ব্যবসা জড়িত। এজন্য ইহার সর্ব্বত্র সহযোগিতা প্রয়োজন। যদি কেহ শুধু লাভের জন্য ব্যবসা করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। পূর্ব্বে বহুবার আমি একথা বলিয়াছি। পরোপকারের দিকে, দেশ-সেবার দিকে নজর থাকিলে ব্যবসার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এখানেই প্রশ্ন উঠে ব্যবসায়ের পদ্ধতি ও অর্থ নিয়োগের।

বাজারের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন জিনিষের মূল্য কম হইলে ক্রেতা সর্ব্বদা মিলিবে। ব্যবসায়ের স্বভাবই এইরূপ। খুব চড়া দামে বাজারে জিনিষ বিক্রয় হইলে বুঝিতে হইবে কোথাও গলদ রহিয়াছে। কোন রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইলেই জিনিষপত্রের মূল্য অস্বাভাবিক রকমে চড়িয়া যায়। বাজারে মাল নাই, অথবা আমদানী নাই এই সকল জল্পনা-কল্পনা হইতেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারটা হয় অনেকটা 'ফটকা' খেলিবার মত। যাহারা কখনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক মাল কিনে না, বাজারে মাল নাই শুনিলে তাহারাও অধিক দামে অনেক জিনিষ কিনিয়া

রাখে। ভয়, পাছে মোটেই না পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় আমরা এই ব্যাপার বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাজারে কোন জিনিষের অভাব ঘটিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আর যদি বা কখনও এইরূপ কিছু ঘটে তাহা হয় শুধু ব্যবসায়ীদের ফট্‌কা অথবা প্রয়োজনের পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণ জিনিষ কিনিয়া রাখিবার জন্য। কিন্তু বাজারের জিনিষের পরিমাণ সম্বন্ধে কেহ সঠিক হিসাব দিতে পারে কি? এসব নিছক কল্পনা মাত্র। অনেকে আবার দুনিয়ার বাজার সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়া থাকে। তাহা আরও ভুল। বাজার সর্ব্বদা সচল, কখনও উহা স্থায়ী ভাবে থাকে না। উহার অবস্থা কখন কিরূপ হয় বলা শক্ত। তবু যদি বা বহু পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয় করিয়া একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করা যায়, হিসাব শেষ হইলে উহা হইয়া পড়ে অতীত কালের ঘটনা। তখন হয়তো বাজারের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবেই, কারণ পণ্যের মূল্য যত কমিয়া যায় নূতন স্তরের ক্রেতা তত বাজারে দেখা দেয়। সকলেই ইহা জানে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তদনুসারে কাজ করে না। বাজার চড়তির সময় অনেক ব্যবসায়ী বহুল পরিমাণে জিনিষ কিনিয়া রাখে, কিন্তু হঠাৎ দাম কমিয়া গেলে তাহাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহারা মনে করে যথাসম্ভব অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করাই ব্যবসায়ের নীতি। তাহা সত্য কি? আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

জিনিষের মূল্যের দিকে না চাহিয়া আমরা সর্ব্বদা প্রয়োজন মত জিনিষ কিনিয়াছি। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ খরিদ করা আমার

খাতায় লেখা নাই। দাম বাড়িয়া গেলে আমরা বেশী দামে জিনিষ কিনি, কমিলে কম দামে কিনিয়া থাকি। মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অধিক জিনিষ কিনিয়া কখনও গুদামজাত করি নাই। সস্তায় মাল কিনিয়া রাখিলে সাময়িক হয়তো সুবিধা হইতে পারে কিন্তু বাজার পড়তির সময় এজন্য যে বেগ পাইতে হয় তাহাতে লাভের আনন্দ দলিয়া পিষিয়া যায়। ফলে লাভ অপেক্ষা লোকসান হয় অধিক। ফট্‌কার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসা চালানো ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়া মাত্র। তখন ব্যবসায়ীর টাকার দিকে অধিকতর নজর যায় এবং তজ্জন্য ব্যবসায়ের মূল নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। তখন আসে ব্যবসায়ে পতন। প্রয়োজন মত জিনিষ ক্রয় করাই ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ততম পথ।

আমাদের বিক্রয়ের নীতি বুঝাইবার জন্য ক্রয়ের নীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলাম। প্রতিযোগিতা অথবা চাহিদার দিকে না তাকাইয়া আমরা চাই কত অধিক সংখ্যক লোকের হাতে আমরা জিনিষ পৌঁছাইয়া দিতে পারি—দাম কত কমাইলে আরও অধিক সংখ্যক লোক তাহা ক্রয় করিতে পারে। আমাদের কারবারের কয়েক বৎসরের হিসাব দেখিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে—

বৎসর	নির্দ্ধারিত মূল্য (ডলার)	প্রস্তুত গাড়ীর সংখ্যা
১৯১০—১১	৭৮০	৩৪৫২৮
১৯১১—১২	৬৯০	৭৮৪৪০
১৯১৫—১৬	৪৪০	৫৩৩৯২১
১৯১৬—১৭	৩৬০	৭৮৫৪৩২
১৯১৭—১৮	৪৫০	৭০৬৫৮৪
১৯১৮—১৯	৫২৫	৫৩৩৭০৬
১৯২০—২১	৪৪০ হইতে ৩৫৫	১২৫০০০০

যে কয়েক বৎসর উপরোক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই সব বৎসরেও ব্যবসায়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। ১৯১৭ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত ছিল যুদ্ধের সময়। ১৯১৭ সালে আমেরিকা মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়াতে কারখানায় যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারী হইতে লাগিল। বাজারের অবস্থা দেখিয়া বলা চলে যে, ১৯২১ সালেও আমাদের মোটরের দর খুব বেশী ছিল না। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর আমরা গাড়ীর কলকজা, সাজসজ্জা ও ধরণ-ধারণের উন্নতি করিয়া গিয়াছি।

বাজারে অন্যান্য কারখানায় তৈয়ারী যে সকল মোটর গাড়ী পাওয়া যায় উহাদের কোন গাড়ীতে কোন অংশ আমাদের গাড়ীর অংশ অপেক্ষা ভাল আছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রত্যেক রকমের গাড়ী একখানা করিয়া কিনিয়া রাখিয়াছি এবং কোন নূতন গাড়ী বাহির হইলেই তাহা কিনিয়া ফেলি। গাড়ী কিনিয়া প্রথমতঃ উহা রাস্তায় চালানো হয়, পরে প্রত্যেকটি অংশ আল্‌গা করিয়া পরীক্ষা করা হয়। পৃথিবীতে যত রকমের মোটর গাড়ী বাহির হইয়াছে, আমাদের ডিয়ারবর্ণের কারখানায় খুঁজিলে উহাদের প্রত্যেক রকমেরই অন্ততঃ একখানা করিয়া পাওয়া যাইবে।

আমরা কোন নূতন গাড়ী কিনিলেই খবরের কাগজে জোর প্রচার করা হয়, "মিঃ ফোর্ড ফোর্ডগাড়ী ব্যবহার করেন না"। আমি একবার একখানা লাঞ্চেষ্টার গাড়ী কিনিলাম। গাড়ীখানা নাকি ইংলণ্ডে তৈয়ারী গাড়ীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সে গাড়ীতে লংদ্বীপ হইতে ডেট্রয়ে আসিতেছিলাম, তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "আমি ফোর্ড

গাড়ীতে না চলিয়া ল্যাঙ্কেষ্টারে চলিয়াছি কেন?" উত্তরে আমি বলিলাম, "এখন আমার তাড়াতাড়ি করিয়া কোন কাজ নাই। বেড়াইতে বাহির হইয়াছি মাত্র, এজন্য ফোর্ড গাড়ীতে চলি নাই।"

ফোর্ড গাড়ী, ফোর্ড কোম্পানী এবং আমার সম্বন্ধে বাজারে এরকম অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

উপরে যে হিসাব দিয়াছি তাহা হইতেই বুঝা যায়, আমাদের গাড়ীর কোন ধরাবাঁধা দাম নাই। মূল্য হ্রাস করিয়া অধিকতর ভাল জিনিষ তৈয়ারী করাই আমাদের নীতি। এজন্য বাজারের অবস্থা বুঝিয়া আমরা গাড়ীর দাম নির্দ্ধারণ করি; পরে খরচ আরও কমাইতে চেষ্টা করি। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াও আমরা গাড়ী নির্ম্মাণের ব্যয় অনেকটা কমাইয়াছি। অভাব-অনটনজনিত কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না থাকাতে আমাদের কারখানার শ্রমিক এবং কর্ম্মচারীগণ খুব করিতকর্ম্মা, অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। দৈনিক পাঁচ ডলার বেতন দিয়া দেখিয়াছিলাম গাড়ী নির্ম্মাণে আমাদের ব্যয় খুব কমিয়াছে। পরে ছয় ডলার বেতন দিয়া দেখিয়াছি খরচ আরও কমিয়াছে। এই হারে বেতন আরও কত বাড়াইব কে বলিবে?

গাড়ীর যে-দামই আমরা যখন ঠিক করিয়াছি, আমাদের ক্ষতি কখনও হয় নাই। ভবিষ্যতে শ্রমিকদের বেতন কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহা যেমন আমরা ঠিক বলিতে পারি না, সেরকম গাড়ীর দামও যে কত কমিবে তাহাও জানি না। পরে যাহা হউক না কেন এসম্বন্ধে বাজে বকিয়া লাভ নাই।

ব্যয় সঙ্কোচ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা সেগুলি সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অধিক পরিমাণে

পণ্যোৎপাদনের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার চাই এবং প্রয়োজনানুসারে অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করা চাই। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে অপচয় ঘটে খুব কম। আমাদের কারখানায় নিষ্প্রয়োজন কোন জিনিষ নাই। কোম্পানী যে খুব বড় তাহা দেখাইবার জন্য আমরা বিশাল অট্টালিকা করি নাই কিংবা অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহার উপর সুদ ধরিয়া আমরা গাড়ী তৈয়ারীর ব্যয় বৃদ্ধি করি নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, কারখানার ইমারৎগুলি সাফল্যের বিজয় প্রাসাদ না হইয়া সমাধির সৌধ হইয়া দাঁড়ায়। কাজ পরিচালনায়ও আমাদের বিশেষ আড়ম্বর নাই। কারখানার কাজ আপনা হইতেই অনেকটা চলে এবং আমাদের জিনিষ দিয়াই আমরা নিজেদের প্রচার করি, প্রচারের জন্য বাগাড়ম্বর ও হৈ চৈ করিয়াছি বলিয়া কখনও মনে হয় না। রকমফের গাড়ী তৈয়ারীর হাঙ্গামাও আমাদের নাই। সর্ব্বদা আমরা এক মডেলের গাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের এত লাভ হয় যে, অনেক সময় টাকা কি ভাবে ব্যয় করিতে হইবে তাহা লইয়া ভাবনায় পড়িতে হয়। তাহা ছাড়া এক জায়গায় দুইটি জিনিষ তৈয়ারী করা আমি ব্যবসা হিসাবে অসম্ভব বলিয়া মনে করি। আমরা বাজারে এমন জিনিষ চালাইতে চাই যে, একবার যে ব্যক্তি আমাদের গাড়ী কিনিবে তাহার যেন বাকী জীবনে আর গাড়ী কিনিতে না হয়। ছোটখাটো মেরামতির জন্য আমরা গাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশও তৈয়ারী করি। অনেকে আমাদের ব্যবসায়ের নীতিকে ভুল বলিয়া মনে করে, কিন্তু ভুল কোথায় তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। ব্যয় সঙ্কোচের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও অন্যান্য যত-প্রকার অপব্যয় নিবারণ করা সম্ভব তাহা আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি।

ব্যয় কমাইবার জন্য আমরা নিজেদের কয়লার খনি, নিজেদের রেল লাইন এবং নিজেদের ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস করিয়াছি। কয়লা হইতে যতটা উপকার পাওয়া সম্ভব সবই আমরা কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় করিয়া লই। এইরূপ নানা উপায়েই আমরা মোটর গাড়ীর দাম এত কমাইতে পারিয়াছি। পরে আরও কমাইতে পারিব কি না তাহা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে।

সস্তায় পণ্যোৎপাদন সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, সস্তায় সকলে জিনিষ কিনিয়া ফেলিলে পরে আর কি করিয়া পণ্য বিক্রয় হইবে? দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রের অধিকতর ব্যবহারে যে সকল লোকজন কর্ম্মচ্যুত হইবে তাহাদের জীবিকার্জ্জনের উপায় হইবে কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম ধরা যাউক। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, রেলগাড়ীর প্রবর্ত্তনে দেশ হইতে গাড়ী উঠিয়া গিয়াছে কি? মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ীকে দূরে সরাইতে পারিয়াছে কি? জুতার কল আমদানী হইবার পর মুচিরা সব না খাইয়া মরিয়া গিয়াছে কি? নিশ্চয়ই সেরকম দুর্ঘটনা ঘটে নাই বরং লোকের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বাড়িয়াছে, জীবন-যাত্রা-প্রণালী অধিকতর সহজ সরল ও আরামপ্রদ হইয়াছে। দেশের ঐশ্বর্য্য, ধনসম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে পরিবর্ত্তনই হউক তাহা কখনও সহসা একদিনে হইয়া সমাজকে উলট-পালট করিয়া দেয় নাই। পরিবর্ত্তনের ফলে যাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে তাহাদের নূতন ক্ষেত্র সন্ধান করিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

তারপর প্রথম প্রশ্নের কথা। ধরিয়া লইলাম দুনিয়ায় এমন একদিন আসিবে যেদিন সস্তায় পণ্যোৎপাদনের ফলে সকলেরই সকল

জিনিষের অভাব মিটিয়া যাইবে এবং বাজারে চাহিদা থাকিবে না। যদি এই অবস্থা কখনও হয় তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্টই হইব। কারণ তখনই আমাদের ব্যবসায়ের কর্ত্তব্য শেষ হইবে। কিন্তু সেদিন আসিবে কি? অন্ততঃ একথা বলিতে পারি যে মোটর সম্পর্কে সেদিন আসিতে এখনও বহু দেরী।

মোটকথা, শ্রমিকের উপর কিংবা ক্রেতার উপর লাভের বোঝা চাপাইয়া না দিয়া কাজ হইতেই লাভ আদায় করিবার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য ব্যবসায়ে আত্মোনিয়োগ করিতে হইবে এবং ব্যবসার উন্নতির জন্য নব নব উদ্ভাবন করিতে হইবে। তখন ব্যবসাও সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। উহাদের সবই সম্ভবপর।

—নয়—

পণ্যোৎপাদন ও ব্যবসার সঙ্গে টাকাপয়সার ব্যাপার এত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত যে ব্যবসায়ের প্রত্যেক পদে পদে টাকার কথা না উঠিয়াই পারে না। কিন্তু পণ্যের উন্নতি ও ব্যবসায়ের ক্রমবৃদ্ধির দিকে নজর রাখিলে—পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য তাহাই—টাকার প্রশ্নটা ব্যবসায়ীকে এতটা কাবু করিতে পারে না। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার নিয়ম-কানুন অত্যন্ত সহজ। আমি নগদ টাকায় কাঁচা মাল কিনি, নগদ টাকায় আমার পণ্য বিক্রয় করি। ফলে সর্ব্বদাই আমার হাতে কিছু না কিছু টাকা থাকে এবং ব্যাঙ্ক হইতেও উহার সুদ পাই। ব্যাঙ্কের সহিত আমার ইহার বেশী আর কোন সম্পর্ক নাই। অধিক সম্পর্ক রাখিবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি না। ব্যাঙ্কের সহিত বেশী সম্পর্ক রাখিবার দোষও যথেষ্ট আছে। কোন ব্যবসায়ী যদি ব্যাঙ্কের কথা অধিক ভাবে তাহা হইলে সামান্য অসুবিধা হইলেই তাহার ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিবার ইচ্ছা যায়। ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্কের কাজে ওস্তাদ হইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যেটুকু জানা একান্ত প্রয়োজন সেটুকু জানিলেই হইল। নচেৎ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসার এই দুইটি মিশিয়া সমস্ত জিনিষটা একটা হ-জ-ব-র-ল হইয়া

যাইবার সম্ভাবনা। টাকার টান পড়িলে কারখানা হইতেই টাকা উঠাইতে হইবে। কারখানাই টাকার স্থান, ব্যাঙ্ক নহে। আমরা অনেকবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

তাই বলিয়া আমরা ব্যাঙ্ক কিংবা প্রয়োজনে টাকা ধার করিবার বিপক্ষে নহি। আমাদের বক্তব্য এই যে, কাজ দ্বারা যেখানে অভাব সঙ্কুলান করা যায়, টাকার অনটন দূর করা সম্ভব হয় সেখানে ধার করা অন্যায়। ধার কারবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে কোথায় এবং কেন টাকার প্রয়োজন। যেখানে টাকা অপেক্ষা মস্তিষ্ক-চালনা ও চিন্তা-শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন বেশী সেখানে টাকা ধার করিয়া বসিলে ব্যবসায়ের গলদ দূর করা সম্ভব হয় কি? ব্যবসা ক্ষেত্রে টাকা যন্ত্রবিশেষ ছাড়া কিছুই নয়। ব্যবসায়ের ভিতরে যদি গোলমাল থাকে তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা ধার না করিয়া এক লক্ষ নূতন যন্ত্র ধার করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু আন্দাজের উপর কতকগুলি টাকা ধার করিয়া বসিলে চলিবে না। এখানে বেশ একটু বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করিবার প্রয়োজন হয়। কারখানার কোথায় কি অপচয়, অপব্যয় হইতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া দূর করিতে হইবে। অপচয়ের একটা স্বভাবই এই যে উহাকে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে উহা কেবল বাড়িয়াই চলে। এই অপচয়ের মূল নষ্ট করিতে পারিলে ব্যবসায় আপনা হইতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিবে। টাকা ধার করিবার কথা তখন মনেও আসিবে না।

ধার করিবার আর একটা দোষ উহা মানুষকে অলস করিয়া তোলে। অনেকে গোলমাল বাঁচাইবার অজুহাত দেখাইয়া টাকা ধার করে। ব্যবসায়ের গোড়াঘর খুঁজিয়া গলদ বাহির করিবার ও

তাহা সংশোধন করিবার মত ধৈর্য্য ও সাহস তাহাদের নাই। ইহার ভিতরে নিজেদের আত্মম্ভরিতার আভাসও কিছু আছে। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার ভিতরে গলদ থাকিবে তাহা স্বীকার করিতে তাহারা নারাজ। কিন্তু ব্যবসা জিনিষই এমন যে উহার স্বাভাবিক গতিকে প্রাণপণ বাধা না দিলে গতি বাড়িয়াই চলিবে। অপচয় কিংবা অব্যবস্থার প্রতিকার টাকা দ্বারা হয় না। টাকা অব্যবস্থাকে বরং আরও স্থায়ী করিয়া তোলে। ব্যবসায়ের গলদ নিবারণের জন্য টাকা ধার করিবার অর্থ যেমন মদ খাইয়া মদের নেশা দূর করিবার চেষ্টা করা। গলদ নিবারণের একমাত্র প্রতিকার গলদের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া।

"ব্যবসার" অর্থ পরস্পরের সহিত জিনিষের আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা পরস্পরের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করা। ব্যবসায়ী যদি ক্রেতাকে এমন জিনিষ দিতে পারে যাহাতে ক্রেতার মূল্য দিতে কষ্ট না হয় এবং পণ্য ক্রয়ে বাস্তবিক তাহার জীবনযাত্রা সহজ হয় তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ের মরণ সহজে হয় না। কিন্তু তাহা করিতে হইলে পণ্যোৎপাদনের দিকে সতত প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারখানার গতি অনেকটা মানুষের শরীরের গতির ন্যায়। মানবদেহের ন্যায় কারখানাও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। উহার যন্ত্রপাতি, শ্রমিক ইত্যাদি যে কোন সময়ে অসাড় হইয়া পড়িতে পারে। এজন্য কারখানার চাই যথোপযুক্ত চিকিৎসা। কারখানার কর্তৃপক্ষ যদি এই সকল না দেখিয়া সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ভাবেন তাহাদের ব্যবসা চিরকাল সমান ভাবে চলিবে তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহাদের শেষ দিনের আর অধিক বাকী নাই।

এই অনবধানতাবশতঃ যে গোলমাল উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার জন্যই ব্যবসায়ীদের মাথায় আসে ধার করিয়া বিপদ উদ্ধারের চিন্তা। ধার মিলেও যথেষ্ট। ব্যাঙ্কগুলি তো ধার দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু এ সময় ধার করিবার অর্থ রোগগ্রস্ত ব্যবসায়কে মরণের পথে আরও আগাইয়া দেওয়া। সাধারণ অবস্থায় যদি কারখানার সুব্যবস্থা না হয় ধার করিয়া কি তাহা করা সম্ভব হয়? এইরূপ ধারণা করাই হাস্যাস্পদ।

যদি কখনও কোন ব্যক্তির টাকা ধার করিতে হয়, তাহা হইলে অভাব অনটনের সময় ধার করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। অর্থাৎ কাজ করিয়া যেখানে অভাব দূর করা সম্ভব সেখানে কাজ না করিয়া টাকা ধার করিবার অর্থ কাজকে ফাঁকি দেওয়া। এখানেই হয় সর্ব্বনাশের বীজ স্থাপন। যখন ব্যবসা খুব ভাল চলে, হাতে টাকা পয়সার অভাব থাকে না ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য তখন ধার করা আমি ততটা দোষাবহ মনে করি না। এই অবস্থায় ধার করা বিপজ্জনকও নয়। কিন্তু ভিতরে গদল থাকিলে বাহিরের আবরণে তাহা ঢাকা চলে না।

বিক্রয়ের নীতির উপরই ব্যবসায়ের স্বচ্ছলতা ও প্রসার নির্ভর করে। বেশী লাভে কম জিনিষ বিক্রয় করা অপেক্ষা অল্প লাভে বেশী জিনিষ বিক্রয় করা ভাল। ইহাতে জিনিষের ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কারবারে অধিক সংখ্যক লোকের কাজের সংস্থান করা যায়; বাজারে জিনিষের চাহিদা থাকায় কারখানা কখনও বন্ধ থাকে না এবং ব্যবসায়ের বাজারেও মন্দা উপস্থিত হয় না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বাজারে মন্দা পড়িলেই টাকা ধার

করিবার প্রয়োজন হয় বেশী। আমাদের কারখানার কাজ বন্ধ থাকে না বলিয়া আমাদের ব্যবসায়ে কোন দিন মন্দা পড়ে নাই। অনেকের আবার ধারণা যে, জিনিষের মূল্য কমাইয়া দিলে লাভ কম হয়। এজন্য আমাকে বহুবার বহু কথা শুনিতে হইয়াছে। যাহারা পণ্যের মূল্য কমাইবার অর্থ বুঝিতে পারে না তাহাদের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি সাধারণ জ্ঞানও নাই বলিতে হইবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ প্রস্তুত করিবার ব্যয়ও যে কমিয়া আসিবে তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্কার, আইনব্যবসায়ী অথবা অতি সাবধানী কারবারী লোকদের এই নীতি বুঝাইয়া উঠা কঠিন। উদ্যমহীনতা ও জড়তার সঙ্গে তাহারা ব্যবসায়ের স্থায়ীত্বকে এক পর্যায়ে ফেলিতে চাহে। পণ্যের মূল্য হ্রাস করিবার কল্পনা তাহাদের মনে আসে না। লাভের টাকা যদি পুনরায় ব্যবসায়ে খাটানো যায় তাহা হইলে ব্যবসায়ের অধিকতর প্রসার ও অধিকতর অর্থাগম হইবেই। আমাদের প্রত্যেক গাড়ী পেছু লাভ খুব কম, কিন্তু মোটের উপর আমাদের লাভ যাইয়া দাঁড়ায় খুব বেশীতে।

লাভের টাকা হইতে বেশী কিছু অংশীদারদের 'ডিভিডেণ্ড' বাবদ না দিয়া আমরা অধিকাংশ টাকা খাটাই কারবারে এবং কিছু শ্রমিকদের ভাগ করিয়া দেই। ফোর্ড কোম্পানীর অংশীদারগণ ডিভিডেণ্ট খুব কম পায়। নূতন টাকা ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দামও অনেকটা কমাইয়া ফেলি। আমাদের লাভের অংশ হইতে ক্রেতাদের বঞ্চিত করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল। একবার আমাদের লাভ আশাতিরিক্ত

রকমে বেশী হইয়া গেল। সে বৎসর যাহারা আমাদের গাড়ী কিনিয়াছিল তখন তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ ডলার করিয়া ফেরৎ দিলাম। সেই সঙ্গে ক্রেতাদের জানাইয়া দিলাম যে, আমরা ভুল করিয়া গাড়ীর দাম বেশী ধার্য্য করিয়াছিলাম। অংশীদারদের লাভের অংশ বেশী দেই না বলিয়া সেই বৎসর কয়েকজন অংশীদার কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়াছিল। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আমি আমার এই নীতির কথাই বলিয়াছিলাম। তখনকার নীতি অনুসারে আমি এখনও কাজ কবিয়া চলিয়াছি। আদালতে আমি দেখাইয়া ছিলাম যে, ৪৪০ ডলার করিয়া যখন আমাদের গাড়ীর দাম ছিল তখন আমরা বিক্রয় করিয়াছিলাম পাঁচ লক্ষ গাড়ী, কিন্তু গাড়ীর মূল্য ৩৬০ ডলারে নামাইয়া বিক্রয় করিয়াছিলাম আট লক্ষ গাড়ী।

যাহারা মনে করে লাভের বেশীর ভাগ অংশীদারদের প্রাপ্য তাহারা অনেকেই আমাদের ব্যবসার নীতি সমর্থন করিবে না। এজন্য আমি কারবারে অংশীদার রাখা পছন্দ করি না। পণ্যোৎপাদনে তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমি চাই অধিক লোককে কাজের সুবিধা দান করিয়া দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে। এজন্য মনে করি, যাহারা কাজ করে তাহারাই কার্য্যকরী অংশীদার; কারণ তাহাদের লক্ষ্য থাকে কারখানার উন্নতির দিকে, লভ্যাংশের দিকে নয়। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করা ও লভ্যাংশ বণ্টন উঠাইয়া দেওয়া, এই দুইটির কোন্‌টি আপনি সমর্থন করেন,' তাহা হইলে লভ্যাংশ উঠাইয়া দিবার পক্ষেই আমি মত প্রকাশ করিব। শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করিয়া কোম্পানীর আয়

বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা মস্ত ভুল। কারণ তাহাতে দেশের ক্রয়-শক্তিও হ্রাস পায়। কোম্পানীর মোটা লাভ হইলেই হইল না। কোম্পানী দেশের ও সমাজের অর্থ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করিল তাহাও দেখিতে হইবে।

শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বেতনের সহিত সর্ব্বদার জন্য একটা পবিত্র ভাব জড়িত রহিয়াছে। অফিসের খাতায় বেতন কতকগুলি আঁকের সমষ্টি মাত্র হইতে পারে কিন্তু বাহিরে শ্রমিকের নিকট ইহার অর্থ পরিবারের সুখ-সুবিধা ও পুত্রকন্যার খেলাধূলা, লেখাপড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরের যাহা কিছু রমণীয় সব। লাভের উপর নির্ভর করে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও ক্রেতা, এই তিন শ্রেণীর লোকের স্বার্থ।

আমরা সর্ব্বদা হাতে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা রাখি। বর্ত্তমানে আমাদের প্রায় পাঁচ কোটি ডলার নানা ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে। প্রয়োজন হইলে ধার পাইব এই মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছি—যদিও ধার করিবার প্রয়োজন আমাদের কখনও হইবে না। কাজ বন্ধ রাখিয়া আমরা কখনও অপচয় করি না কিংবা মরসুমের সময় আমরা বেশী কাজ করি না। আমাদের কারখানায় বারমাসই মরসুম লাগিয়া রহিয়াছে। মরসুম বুঝিয়া কোম্পানী খোলা ও বন্ধ রাখিলে ভাল শ্রমিক পাওয়া কষ্টকর হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করিতে সুদক্ষ শ্রমিক আসিবেই বা কেন? সুদক্ষ ও কর্ম্মঠ লোকের কাজের অভাব কি? বারমাস সমান ভাবে কাজ চালাইবার জন্য আমাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসটা ছিল ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটা স্মরণীয় কাল। সেই সময় অনেকগুলি মোটরের কারখানা বন্ধ হইয়া যায়। যেগুলি বন্ধ হয় নাই সেগুলিও ছিল সব ব্যাঙ্কের হাতে আটক। তখন ফোর্ড মোটর কোম্পানীর নামেও বাজারে গুজব রটিয়া গেল যে, মিঃ ফোর্ড টাকা ধার করিবার জন্য ব্যাঙ্কের দরজায় দরজায় ঘুরিতেছেন কিন্তু কোথাও ধার মিলিতেছে না। ফোর্ড কোম্পানীর নামে অনেক কথাই অনেকবার শুনিয়াছি, কোন কথায় কখনও কান দেই নাই। কিন্তু এবার গুজবের একটা বিশেষত্ব ছিল। তাই গুজবটাকে নেহাৎ উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। এমন কথাও শুনিলাম যে, অর্থাভাবে আমাকে ব্যবসা গুটাইতে হইবে।

কথাটা এই—১৯১৯ সালে কোম্পানীর নানাপ্রকার আসবাবপত্র কিনিবার জন্য আমরা প্রায় সাত কোটি ডলার ধার করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার শোধ করিবার তখনও বাকী ছিল। তাহা ছাড়া আয়কর বাবদ গবর্ণমেণ্টকে দিবার বাকী ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার এবং শ্রমিকদের বার্ষিক 'বোনাস' দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম ৭০ লক্ষ ডলার। মোটের উপর ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের। কিন্তু আমাদের হাতে তখন মজুত ছিল মাত্র দুই কোটি ডলার। বাকী ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার পাই কোথায়? আমাদের হিসাব নিকাশের ব্যাপার বিশেষ গোপন রাখি না; সকলেই আমাদের আর্থিক অবস্থা জানে। এজন্য গুজব রটিল ধার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তিন চার কোটি ডলার ধার করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকরও হইত না।

যে কোন ব্যাঙ্কে চাহিবামাত্রই আমরা ধার পাইতাম। টাকার বাজারে আমাদের একটা সুনাম ছিল।

আমাদের আর্থিক অবস্থার খুঁটিনাটি লইয়া কাগজপত্রেও খুব লেখালেখি চলিতে লাগিল। যাহারা চিরকাল আমাদের বিষের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, এই সুযোগে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে তাহারা ছাড়িল না। কিন্তু আমি কোন গুজব কিংবা বিরুদ্ধ প্রচারের প্রতিবাদ করিলাম না। মনে মনে কার্য্যপদ্ধতি ঠিক করিতে লাগিয়া গেলাম।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, অভাবের সময় টাকা ধার করা খুবই ভুল এবং উহা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ। এজন্য ধারের কথা কাহাকেও মনে করিতে দিলাম না। আমার চিরন্তন নীতি অনুসারে চেষ্টা করিলাম প্রতিদিন আরও অধিক সংখ্যায় গাড়ী প্রস্তুত করিয়া উহার মূল্য আরও হ্রাস করিতে এবং কারখানার সব রকম অপচয় নিবারণ করিতে। গাড়ীর দাম কমাইয়া দেখিলাম আমাদের বিক্রি অনেকটা বাড়িয়াছে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই আবার মন্দা দেখা দিল। বুঝিলাম সাধারণ ক্রেতার পক্ষে গাড়ীর দাম তখনও বেশী রহিয়াছে; মূল্য আরও হ্রাস করা প্রয়োজন। তখন কারখানার খরচ আরও কমান দরকার মনে করিলাম। সমস্ত গুছাইয়া লইবার জন্য দুই সপ্তাহ কারখানা ছুটি দিলাম। কিন্তু কাজ শেষ করিতে দুই সপ্তাহের জায়গায় ছয় সপ্তাহ লাগিয়া গেল। তখন বাজারে হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, ফোর্ড কোম্পানীর দরজা আর খুলিবে না।

তখনও আমরা বাজারে টাকার জন্য বাহির হই নাই। কিন্তু সকলেরই ধারণা ছিল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া ব্যাঙ্কের দ্বারে

আমাদের ধন্না দিতেই হইবে। তবু ব্যাঙ্কের দুয়ারে আমাদের কেহ দেখিল না। নিউ ইয়র্কের কোন ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় আমাদের বলিল, টাকা ধার দিতে তাহারা রাজী কিন্তু তাহাদের একজন কর্ম্মচারীর হাতে আমাদের টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যাঙ্ককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম।

নূতন ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখা গেল, যুদ্ধের সময় যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারী করিতে যাইয়া কারখানায় অনেক গলদ ঢুকিয়াছে। তাহাতেই অপচয় হইতেছে খুব বেশী। তাহা ছাড়া তখন আরও কতকগুলি নূতন নূতন ডিপার্টমেণ্ট খোলায় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত অধিক। সেগুলি সব দূর করা হইল।

মোটর তৈয়ারীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিলাম। কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমান হইল। তাই বলিয়া তাহাদের কর্ম্মচ্যুত করা হইল না। তাহাদের ফোর্ড কোম্পানীর নানা দোকানে দেওয়া গেল। বিভিন্ন অংশ যাহারা তৈয়ারী করিত তাহাদের অনেককে মোটর তৈয়ারী করিতে দিলাম। পূর্ব্বে যেখানে প্রতিদিন হাজার গাড়ী তৈয়ারী হইত সেখানে দিনে চার হাজার গাড়ী তৈয়ারী হইতে লাগিল। ফলে এপ্রিল মাসের শেষে আমাদের দেয় টাকা শোধ করিয়া দেখা গেল হাতে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ডলার বেশী রহিয়াছে। পূর্ব্বের ঋণ, দেয় আয়কর এবং শ্রমিকদের বোনাস সবই দেওয়া হইল এই কয়মাসের মধ্যে। কারখানার সুব্যবস্থা করিয়া অপচয় বন্ধ করিলে টাকার অভাব যে কখনও হয় না তাহাই আমরা দেখাইয়া দিলাম।

আমরা যখন মোটরের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে কমাইয়া দিলাম অথচ ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাতিলাম না তখন আবার চারিদিকে আমাদের সমালোচনা চলিতে লাগিল, আমরা নাকি বাজারের গতি নষ্ট করিয়া দিতেছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা তাহাই করিতেছিলাম কি? আমরা বরং বাজারকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া ফেলিতেছিলাম। বাজারের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তখন আবার অনেকে ধুয়া ধরিল ইউরোপকে খুব বড় হাতে ঋণ দেও। এই নীতি অনুসারে কাজ করিলে কিছু সময়ের জন্য ইউরোপ হয়তো আমেরিকার মাল টানিতে পারিত এবং সেই সুযোগে আমাদের ব্যবসায়ীগণ তাহাদের গুদামজাত মাল কতকটা খালাস করিতে পারিত। কিন্তু ভবিষ্যতে উহার ফল কি দাঁড়াইত তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে কি? যে ব্যাঙ্কগুলি ইউরোপকে ঋণ দিত তাহারা আর টাকা ফেরৎ পাইত না। ফলে তাহাদের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইত। ব্যাঙ্ক বন্ধের শোচনীয় পরিণামের কথা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে।

যাহা হউক, আমাদের নিজের কথা বলি। আমরা কারখানা গুছাইবার চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে চার কোটি ডলার ধার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের ব্যবসায়ের কোন লাভ হইত কি? টাকা ধার করিয়া বসিলে আমরা নিশ্চয়ই কারখানার গলদ দূর করিতে চেষ্টা করিতাম না। গলদগুলি থাকিয়াই যাইত এবং মোটরের দাম কমাইয়াও সাধারণের উপকার করিতে পারিতাম না। তাহা ছাড়া, পাঁচ কোটি ডলারের জন্য আমাদের প্রতি বৎসর যে সুদের জের টানিতে হইত তাহাতেই সমস্ত লাভ শোষণ করিয়া

লইত। কিন্তু ব্যাঙ্কারগণ আমাদের বলিয়াছিল টাকা ধার করিতে, কারখানা গুছাইতে কেহ্ কখনও বলে নাই।

এখানেই ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কারের প্রতিপত্তি রাখিবার দোষ। তাহারা কারখানাকে দেখে টাকার দিক দিয়া, পণ্যোৎপাদনের দিক দিয়া নহে। ব্যবসায়ের অবস্থা যে চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না, তাহারা তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। পণ্যের মূল্য হ্রাস করাকে তাহারা মনে করে ন্যায্য লাভ ছাড়িয়া দেওয়া। আমার মনে হয়, ব্যাঙ্কারগণ বড় বড় কারখানার কাজ চালাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ব্যবসায়ের শিক্ষা তাহাদের লাভ হয় নাই। তবু যে কারখানাগুলি সবই তাহাদের হাতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহা সম্ভবপর হইয়াছে শুধু ব্যবসায়ের প্রচলিত নিয়মের জন্য। তাই বলিয়া আমি ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কারদের শুধু নিন্দাই করিতেছি না। জগতে অর্থনীতিবিদ্‌দের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। টাকা লেন-দেনের সুবিধা না থাকিলে ব্যবসা চলা অসম্ভব। এই লেন-দেন চালাইতেছে ব্যাঙ্ক। কিন্তু সম্প্রতি ব্যবসায়ের ধারার যে-ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাতে ব্যাঙ্কের আর বেশীদিন কারখানার প্রভু হইয়া থাকিতে হইবে না। ব্যাঙ্ক হইবে শিল্প ও কারখানার সেবক স্বরূপ। তখন টাকা ব্যবসা না চালাইয়া, ব্যবসাই টাকাকে চালাইবে এবং ব্যাঙ্কগুলির নজর টাকার দিকে না থাকিয়া থাকিবে সমাজ সেবার দিকে। ব্যাঙ্ক তখন দেখিবে কি করিয়া দেশের অধিকতর উপকার সাধন করা যায়। তখন টাকার বাজারেও কোন প্রকার গোলমাল থাকিবে না। টাকার গোলমাল না থাকিলে দেশে দারিদ্র্য এবং অভাব থাকিতে পারে না। দারিদ্র্য-দোষ দূর করা তেমন কিছু শক্ত নয়। ইহা দূর করা না-করা মানুষেরই আয়ত্তের মধ্যে।

—দশ—

দারিদ্র্য-দোষ সম্বন্ধে ছেলেবেলা হইতেই অনেক কথা শুনিয়া আসিতেছি। সমাজদেহ হইতে এই শত্রুকে দূর করিবার মহনীয় চেষ্টাও কম করা হয় নাই। বস্তুতঃ দারিদ্র্যকে ইচ্ছা করিলেই দূর করা যায়। ইহা দূরীকরণের একমাত্র উপায় নূতন নূতন কার্য্যের উদ্ভাবন করা এবং নব নব কার্য্যপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা। আইন করিয়া দারিদ্র্য দোষ দূর করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষের খাইবার, পরিবার ও থাকিবার স্থানের অভাবকে আমি দারিদ্র্য বলি। অবশ্য দুনিয়ার সকলেই যে এক ভাবে থাকিবে খাইবে তাহার কোন অর্থ নাই। কারণ দুইজন মানুষও একরকম নয়। মনে ও দেহে তাহাদের পার্থক্য অনেক। এক্ষেত্রে সকল মানুষকে সমানভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কল্পনা মাত্র। ইহাতে বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা অর্থাৎ দারিদ্র্য যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ বা পরিবার-বিশেষে আবদ্ধ ছিল সেখানে সকলকে সমান স্তরভুক্ত করিবার অর্থ সেই দারিদ্র্যকে সকলের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া। ইহাকে এছাড়া আর কি বলা চলে? যাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, কার্য্য-ক্ষমতা অধিক তাহাকে যদি টানিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও অল্প কর্ম্মক্ষম লোকের স্তরে নামান হয় তাহা হইলে

শেষোক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে না; বরং অধিকতর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। বর্ত্তমান জগতে যোগ্যব্যক্তিগণ এখানেই ভুল বুঝিয়াছেন। দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে চাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য্য। একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যোৎপাদনেই তাহা সম্ভব। শিল্প-জগৎ এদিকে অবশ্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সে দিন বোধ হয় খুব দূরে নহে যে-দিন প্রত্যেকেই তাহার পরিশ্রমের অনুপাতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইবে। মানুষের এই দাবী মিটাইবার জন্য প্রয়োজন শুধু নব নব উদ্ভাবনা শক্তির, নব নব কার্য্য প্রণালীর।

পণ্যোৎপাদন ও পণ্য সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই এখনও দারিদ্র্যের এত প্রকোপ। কৃষি ও শিল্প উভয়ের পক্ষেই এই কথা বলা চলে। উৎপাদন ও সরবরাহের সামঞ্জস্য না থাকায় অপচয়ও হয় যথেষ্ট। ইহা দূর করিবার জন্য চাই শুধু দূরদর্শী ও বিজ্ঞ লোকের প্রতিভা। অদূরদর্শী লোকের পক্ষে অপচয় ধরিয়া উঠা অসম্ভব। এজন্য তাহাদের দ্বারা একাজ হইবে বলিয়াও আশা করা যায় না। তাহারা শুধু টাকার আঁকটাকেই বড় করিয়া দেখিয়া থাকে।

পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ইচ্ছা করিলে কারখানার মালিকগণও করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের অপচয়ের জন্য শ্রমিকগণও অনেক সময় প্রয়োজনমত জিনিষপত্র পায় না। পণ্যের অত্যধিক মূল্যের জন্য এই অপচয় ঘটিয়া থাকে এবং পণ্য দেশের অধিক লোকের হাতে যাইয়া পৌঁছে না।

আমাদের কতকগুলি অপচয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও দৃষ্টান্ত আমেরিকা হইতে দেওয়া হইতেছে, তথাপি সকল দেশের পক্ষেই কথাগুলি খাটে। মিসিসিপি নদীর শক্তির অপচয়ের কথা ধরা যাউক। মিসিসিপির এলাকায় কয়লা নাই, অথচ এই নদীর বিরাট স্রোত-শক্তির কোন প্রকার ব্যবহার হয় না। এই এলাকার লোকদের কয়লা আনিতে হয় বহু দূরদেশ হইতে, এজন্য মূল্যও দিতে হয় প্রচুর। কয়লা কিনিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহারা গাছ কাটিয়া কাঠ করিয়া লয়। সবে সেদিন মাত্র মিসিসিপির স্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া এই এলাকার অধিবাসীদের সহস্র অভাব দূর করা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় অথবা ব্যয়-সঙ্কোচ দ্বারা কখনও দারিদ্র্য দূর করা যায় না। ইহার একমাত্র প্রতিকার পণ্যোৎপাদনে অধিকতর সুব্যবস্থা। ব্যয় সঙ্কোচ, সঞ্চয় ইত্যাদি কথাগুলি লইয়া দুনিয়ায় অনেক নাড়া-চাড়া করা হইয়াছে। লক্ষ লোক লক্ষাধিক বার এই বুলি আওড়াইয়াছে। কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। ব্যয়-সঙ্কোচ কথাটার সঙ্গে মনে হয় যেন ভয় জড়ান রহিয়াছে। বাঁচিয়াও যাহারা মৃতপ্রায়, মনে যাহাদের জোর নাই, ব্যয়-সঙ্কোচ কথাটা তাহাদের পক্ষেই শোভা পায়। অবশ্য অপব্যয় অপেক্ষা যে ব্যয় সঙ্কোচ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনের মূল্যবান দিনগুলি যে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি মুদ্রা নাড়া-চাড়া করিয়াই কাটাইয়া দিতে হইবে তাহারই বা অর্থ কি? এই সকল ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় 'ব্যয়-সঙ্কোচের অপর নাম অপব্যয়—ইহা জীবনের রস নষ্ট করিয়া ফেলে, জীবনকে আনন্দ উপভোগ হইতে বাঞ্চিত করে। অপব্যয় ও

ব্যয়-সঙ্কোচ উভয়কেই অপচয় বলা চলে। একটিতে অন্যায় ব্যবহারে জিনিষ নষ্ট হয়, অপরটিতে অব্যবহারে জিনিষ পঁচাইয়া ফেলে। ব্যয়সঙ্কোচ অপব্যয়ের প্রতিঘাত হইতেই উদ্ভূত।

সঞ্চয়ের দিকে অনেকেই খুব বেশী নজর দেয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস অবশ্য খুবই ভাল এবং সঞ্চয় করিবার প্রয়োজনও যথেষ্ট। কিন্তু ইহা লইয়া খুব বাড়াবাড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা ছেলেপুলেদের সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেই। অপব্যয় বন্ধ করিবার পক্ষে এই শিক্ষার উপকারীতা যথেষ্ট। কিন্তু ইহা শিশু-মনের আত্মবিকাশের সহায়ক নহে। সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কোন দিকে অর্থ খাটাইলে উহা আরও বৃদ্ধি পায়। কষ্ট করিয়া মানুষ যে টাকা জমায় তাহা জমাইয়া না রাখিয়া যদি কোন কাজে লাগান যায় তাহা হইলেই অর্থের ব্যবহার হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তখন বরং সঞ্চয় হইতে পারে আরও অধিক। যুবকদের উচিত টাকা জমাইয়া না রাখিয়া কোন কাজে তাহা খাটান। ইহাতে অর্থ করিবার উদ্ভাবনী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। অর্থকরী উদ্ভাবনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে সঞ্চয়ের ভাবনা ভাবিতে হয় না। তখন সঞ্চয় নিজেই নিজের ভাবনা ভাবে। অর্থের সুব্যবহারই অর্থ সঞ্চয়ের প্রধান পথপ্রদর্শক। অর্থের ব্যবহারেই অর্থ বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারের প্রাণশক্তি আছে, অব্যবহারের তাহা নাই।

অনেকে মনে করে টাকা থাকিলেই সব হইল। কিন্তু টাকার যদি উৎপাদিকা শক্তি না থাকে তাহা হইলে উহার মূল্য কি? অন্ধের ন্যায় টাকাকে পূজা করিলে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের অবমাননা করা হয়।

হেনরী ফোর্ড

অনেকের ধারণা কৃষি ও শিল্পের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান রহিয়াছে—এমন কি উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত সম্ভব। শিল্পী কৃষককে দিতে পারে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কৃষির জন্য সমস্ত উপকরণ এবং কৃষকও দিতে পারে শিল্পীকে কারখানা চালাইবার জন্য কৃষিজাত সমস্ত দ্রব্য। উভয়ের সহযোগিতায় জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে সুখময় করিয়া তুলিতে পারা যায়।

অনেক কাজ আছে যাহা সমস্ত বৎসর সমান ভাবে চলে না; বৎসরে তিন চার মাস মরসুমের জন্য বসিয়া থাকিতে হয়। রাজমিস্ত্রী শীতের সময়টা বসিয়া কাটায়, কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপনের পর অলস জীবন যাপন করে। জমির শস্য পাকিবার আশায় সে উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে। এই সময়টায় তাহার কোন কাজই করিবার থাকে না। যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, কৃষক তাহার অবসর সময়টা কারখানায় কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিবে এবং কারখানার শ্রমিকগণও কৃষির সময় কারখানা ছাড়িয়া ভূমি কর্ষণ, ক্ষেত্রে বীজ বপন ইত্যাদি করিবে তাহা হইলে উভয়ের জীবন-যাত্রার পথ কত সুগম হয়। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই প্রকার সহযোগিতা স্থাপন করিলে কৃষক ও শ্রমিক কাহারও পক্ষে 'মন্দা' সময় বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। আমি মনে করি পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সহযোগিতা স্থাপন করাই স্বাভাবিক নিয়ম।

অর্থের দিক দিয়া ছাড়া অন্য দিকেও এই সাহচর্য্যের যথেষ্ট উপকারীতা রহিয়াছে। কৃষি ও শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতার অমূলক কল্পনা মানুষের মনকে যে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে উভয়ের সহযোগিতায়

তাহা দূর হইতে বাধ্য। জীবনধারাকে বহুমুখী করিতে পারিলেই জীবনের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। তখনই বুঝা যায় প্রত্যেক ধারারই পরস্পরের সহিত কিরূপ নিকট সম্বন্ধ। বিরাট প্রকৃতির সহিত, অনন্ত উন্মুক্ত আকাশের সহিত আবদ্ধ-কারখানার কোন শত্রুতা নাই। প্রকৃতি কারখানাকে সাহায্য করিতে এবং কারখানা প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার :পথ সহজ ও সুগম করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কোন কাজ নাই। যাহা কাম্য, যাহা ন্যায় তাহা তো কখনও অসম্ভব হইতে পারে না। তাহা পূর্ণ করিতে হইলে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'বহুজন হিতায়', 'বহুজন সুখায়' করিতে হইবে লোভ ও স্বার্থত্যাগ, বিভেদ ভুলিয়া কাজের জন্য সকলকে হইতে হইবে সঙ্ঘবদ্ধ।

যাহারা ধনী অথবা যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাহারা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত বৎসরের তিন চার মাস কোন গ্রীষ্মাবাসে বা শৈলশিখরে কাটাইয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভব কি ? সময় এবং অবকাশ থাকিলেও তাহারা সময় কাটায় অন্য কোন রকম কাজে। কারখানাগুলির উচিত শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের সুব্যবস্থা করা। বৎসরের বারমাস সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক, প্রান্তরের নির্ম্মল বায়ু সেবন হইতে বঞ্চিত হইয়া যাহারা কারখানার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, জীবন ধারা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান যে গণ্ডীবদ্ধ থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ! কাজের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে তাহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সম্ভার উপভোগ করিতে পারে, চেষ্টা করিলে সেইরূপ ব্যবস্থা করা যায়।

অনেকে মনে করিতে পারে, কারখানা হইতে তিন চার মাসের জন্য শ্রমিকদের সরাইয়া নিলে পণ্যোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবতার চোখে দেখিতে গেলে সেরূপ কিছু হয় না। তিন চার মাস মুক্ত বায়ুতে কাজ করিয়া শ্রমিকগণ যখন কারখানায় ফিরিবে তখন তাহারা কাজ করিবে পূর্ণোদ্যমে, দ্বিগুণ উৎসাহে। পরিবর্ত্তনের একটা উপকারীতা আছে। তাহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে কাজ করায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ের যে অপর দিক দিয়া সংস্থান হইল তাহা কি বিবেচ্য নহে? এখানেই কৃষি ও শিল্পের সহযোগিতার মূল তাৎপর্য্য।

আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই কৃষি ও শিল্পের সাহচর্য্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলাম। এদিকে আমাদের চেষ্টাও যথেষ্ট ফলবতী হইয়াছিল। সে কথা বারান্তরে বলিব।

ডেট্রয়ের অনতিদূরে নর্থভিলে আমাদের এক প্রকার যন্ত্র তৈয়ারী করিবার ছোট একটা কারখানা ছিল। সেখানে গ্রামের লোকেরাই কাজ করিত। কারখানা ছোট ছিল বলিয়া কাজও তেমন বেশী হইত না। গ্রামের লোকেরা প্রয়োজনমত কারখানায় কাজ করিত এবং বাকী সময়টা নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে খাটিত।

তাহা ছাঁড়া ডেট্রয় হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে ফ্ল্যাটরকে কাঁচ তৈয়ারী করিবার জন্য আমাদের একটা কারখানা আছে। সেখানেও গ্রামের লোকেরা আসিয়া সময় মত কাজ করে। এই কারখানাটা অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার চারিদিকে জমিও প্রচুর, কৃষকেরা এখানে ইচ্ছামত জমি লইয়া চাষ করিতে পারে। গ্রামে কারখানা করিবার

আর একটা সুবিধা এই যে, সহরের দূষিত আবহাওয়া ঢুকিয়া গ্রাম্য পবিত্রতাকে কলুষিত করিতে পারে না। কৃষি ও শিল্পের সাহচর্য্যের ইহাই কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়? একমাত্র কৃষিকার্য্যে গ্রাম্য শ্রমিকদের যে আয় হয়, পল্লীতে ছোট কারখানা স্থাপন করিলে তাহাদের আয়ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য দূরীকরণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায় আর কি হইতে পারে?

বড় বড় কারখানাগুলি যে শুধু শিল্প-প্রধান সহরেই থাকিবে তাহা আমি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কার্য্যক্রমে কারখানাগুলি একস্থানে যাইয়া জুটিয়াছে। পণ্যোৎপাদনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখা যাইবে একটা জিনিষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তৈয়ারী করা যাইতে পারে তখন কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে চিরন্তন মতও বদলাইয়া যাইবে। তখন সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, ছোট নদীর তীরে বড় কারখানা অথবা বড় নদীর তীরে ছোট কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈয়ারী করিলে পণ্যোৎপাদনের ব্যয়ও খুব কম পড়িবে। অবশ্য এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম নাই তাহা বলিতেছি না। কতকগুলি জিনিষ আছে যাহার জন্য খুব বড় প্রতিষ্ঠান এবং অগণিত লোকজন না হইলে কাজ চলা সম্ভব নয়।

শিল্পের কারখানাগুলি আর অধিক দিন বড় বড় সহরে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিবে না। অদূর ভবিষ্যতে দেশের সর্ব্বত্র ছোট ছোট কারখানার উদ্ভব হইবে। সহরগুলি সব প্রায় দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। অধিক কাল এভাবে চলা অসম্ভব। অবশ্য সহর হইতে

যে আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে সে কথা সর্ব্বদা স্বীকার্য্য। সহরগুলি গড়িয়া না উঠিলে পল্লীর শান্তিময় জীবন্তমূর্ত্তি আমাদের চোখে প্রতিভাত হইত না। স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক সঙ্ঘগঠন প্রভৃতি জ্ঞান আমরা পাইয়াছি সহর হইতে। এদিকে আবার সমাজ-দেহে যে সকল দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে তাহারও মূল উৎস সহরে। সহরের ব্যয় বাহুল্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। সহরগুলি সবই নিঃসহায়, নিঃসম্বল। পল্লীগ্রাম হইতে খাইবার জিনিষ না গেলে উহাদের অনাহারে থাকিতে হয়, পরিধানের বস্ত্র না গেলে লজ্জা নিবারণ হয় না। সহরের জীবন-পদ্ধতি এত অস্বাভাবিক যে, কালে কালে ইহার জন্যই লোক নাগরিক জীবনের উপর বিরূপ হইয়া পড়িবে।

সস্তায় ও সহজে পণ্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করাই দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায়। পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অপচয়ও নিবারণ করিতে হইবে, কারণ, অপচয় হইতেই দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়। পূর্ব্বে এই সকল কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি পুনরায় বলা প্রয়োজন যে, দেশের উপকারের জন্য সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পণ্যোৎপাদন অনায়াসে করা যায়, কিন্তু ধনিক ও ব্যবসায়ীর মূলধন হয় এই কার্য্যে প্রধান বাধা।

সস্তায় পণ্যোৎপাদন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের হাতে জিনিষ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্য যে ধনিক ও মূলধনের থাকে তাহা সমাজের পক্ষে কখনও ক্ষতিকর হয় না। শ্রমিকের সুখ-সুবিধা, দেশের ও দশের কল্যাণ যে ধনিক কামনা করে, ব্যবসায়ের লাভকে সে নিজস্ব জিনিষ, নিজের শ্রমের পুরস্কার বলিয়া মনে করে না।

পণ্যোৎপাদনে যাহারা তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, লাভের অংশ তাহাদেরও প্রাপ্য বলিয়া সে স্বীকার করে। মূলধনের কার্য্য অর্থ-বৃদ্ধি নয়, জীবনের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি। আমরা যদি শিল্প কারখানার সাহায্যে সমাজের সমস্যার সমাধান করিতে না পারি তাহা হইলে বলিতে হইবে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই বাকী রহিয়াছে।

—এগার—

কৃষি ও শিল্পের সহযোগিতা স্থাপনে আমরা কি করিয়াছি তাহা দেখা প্রয়োজন। সত্য বলিতে গেলে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভূমি কর্ষণের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেই ফোর্ড কোম্পানীর উৎপত্তি। কিন্তু দৈবক্রমে আমাদের কারখানা হইয়া উঠিল মোটর গাড়ীর কারখানা। ছেলেবেলায় 'কৃষিক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেখিয়া ভাবিতাম কি করিয়া ভূমিকর্ষণ ও কৃষিকার্য্যকে আরও সহজ করা যায়। আমার প্রথম আবিষ্কারও ভূমিকর্ষণের জন্য মোটর ইঞ্জিন বা ট্র্যাক্টর। কিন্তু তখন মোটর ট্র্যাক্টরের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না বলিয়া আমরা মোটর গাড়ী নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। তখন সকলে চাহিত মোটর গাড়ী। কৃষিক্ষেত্রের কাজের উন্নতি হউক বা না হউক কেহ সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কিন্তু হঠাৎ আমাদের ভূমি-কর্ষণের জন্য মোটর ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইল। আমাদের প্রথম ইঞ্জিন রপ্তানী হইতে লাগিল লণ্ডনে। এজন্য আমাদের কারখানায় ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবারও একবৎসর পরে আমেরিকার কৃষকদের হাতে উহা পড়ে। ১৯১৭-১৮ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে আমরা পাঠাইয়াছিলাম

প্রায় পাঁচ হাজার মোটর ইঞ্জিন। তখন যুদ্ধের সময়। জার্ম্মেনী যেখানে-সেখানে মিত্রপক্ষের জাহাজগুলিকে ডুবাইয়া মারিতেছে। কিন্তু আমাদের প্রেরিত ইঞ্জিনগুলি সবই নিরাপদে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। পরে বৃটিশ গবর্ম্মেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের ট্র্যাক্টরগুলি না পাইলে যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে না খাইয়া মরিতে হইত। ইংলণ্ডে তখন খাদ্যদ্রব্যের খুবই অভাব।

১৯১৭ সালে আমেরিকা মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধে যোগ দিল। তখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মাল সরবরাহ করিবার জন্যই সমস্ত জাহাজ ব্যস্ত। ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়ার উপায় নাই। বহু ইংরেজ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র আমেরিকায় পাঠাইয়া দিতে লাগিল। বৃটিশ গবর্ম্মেণ্ট দেখিলেন, ইংলণ্ডের যে জমি রহিয়াছে তাহার এক ইঞ্চিও বৃথা পড়িয়া থাকিতে দেওয়া অসম্ভব। অথচ জমি চাষ করিবার মত জন্তুও দেশে নাই। তখন আমাদের ডাক পড়িল।

আমাদের ইঞ্জিনগুলি এত সহজ ও সরল ছিল যে, সাধারণতঃ মেয়েরাই তাহা চালাইত। এই ইঞ্জিনের সাহায্যে ইংলণ্ডের খেলার মাঠ, বন-ভূমি, পতিত জায়গা সব চাষ করা হইল। ট্র্যাক্টর চালাইতে পুরুষ মানুষের প্রয়োজন না হওয়ায় যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী করিতে কখনও মানুষের অভাব হইত না। নচেৎ বহুলোককে হয়তো কৃষি কার্য্যের জন্য লাগিয়া থাকিতে হইত।

ম্যাঞ্চেষ্টারে আমাদের কারখানার প্রদর্শনী ঘরে কয়েকটা ট্র্যাক্টর রাখা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের গবর্ম্মেণ্ট কৃষি সমিতি সেগুলি পরীক্ষা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নির্ম্মিত ট্র্যাক্টর দেখিয়া তাঁহাদের

মনঃপূত হয় নাই। উঁচু নীচু জায়গায়, সমতল ভূমিতে নানারকম ভাবে আমাদের ইঞ্জিনগুলি পরীক্ষা করা হইল। কতিপয় পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ারও আমাদের ট্র্যাক্টর নানারকম ভাবে দেখিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভূমি কর্ষণের পর ট্র্যাক্টর ভাঙ্গিয়া উহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করা হইল। পরীক্ষায় সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ঠিক হইল আমাদের কোম্পানীতে অর্ডার দেওয়া হইবে।

পরীক্ষার অব্যবহিত পরই আমরা তার পাইলাম বহু ট্র্যাক্টর বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করিতে হইবে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনুমতি অনুসারে আমাদের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ফেরৎ তারে জানাইলাম যে অর্ডার গ্রহণে আমরা রাজী। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সোরেনসনকে ইংলণ্ডে পাঠাইলাম। মিঃ সোরেনসন আমাদের ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়াই তাঁহাকে পাঠান গেল।

সাব্যস্ত হইল যে ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ট্র্যাক্টরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু তখন আর এক বিপদ উপস্থিত। জুন মাসে জার্ম্মেনী ন্যায়-অন্যায় না ভাবিয়া এরোপ্লেন হইতে ইংলণ্ডের নানাস্থানে বোমা ফেলিতে আরম্ভ করিল। কোন কারখানায়ই আমাদের ইঞ্জিনের অংশ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। অগত্যা একটি কোম্পানী রাজী হইল, কিন্তু তাহারা যে দাম হাঁকিল তাহাতে দেখা গেল প্রতি ইঞ্জিনের দাম যাইয়া পড়ে দেড় হাজার ডলারে। মিঃ সোরেনসন মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, সাত শত ডলারের অধিক কোন ইঞ্জিনের দাম পড়িতে পারে না।

বৃটিশ মন্ত্রী বলিলেন, "এই দামে পাঁচ হাজার ট্র্যাক্টর আমাদের দিতে পারেন?"

"পারি"।

"কতদিনের মধ্যে"?

"দুই মাস আন্দাজ"।

তখনই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া মিঃ সোরেনসন পরের জাহাজে আমেরিকা রওনা হইলেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যখন ট্র্যাক্টরের চুক্তি লওয়া হইল তখন আমাদের হাইল্যাণ্ড পার্কের কারখানা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত ছিল। এজন্য ডিয়ারবর্ণের কারখানাকে বাড়াইয়া নূতন যন্ত্রপাতি যাহা দরকার বসান হইল। দুই মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই নিউইর্কের "ডকে" বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে আমাদের ট্র্যাক্টরের প্রথম কিস্তি যাইয়া পড়িল। কিন্তু জাহাজের অভাবে সেগুলি পাঠাইতে দেরী হইয়া গেল। অতঃপর ১৯১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারে জানিলাম ট্র্যাক্টরগুলি নিরাপদে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। পরে তিন মাসের মধ্যে পাঁচ হাজার ট্র্যাক্টরের চুক্তি শেষ করিলাম। আমার নিজের দেশে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্য আমার কারখানার কলে চলিতে লাগিল।

ঘোড়া ও গরুর সাহায্যে জমি চাষ করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তাহা আমার জানা আছে। নিজেও দিনের পর দিন রোদে বৃষ্টিতে লাঙ্গল ধরিয়া ঘোড়ার পেছনে পেছনে চলিয়াছি। পশুদ্বারা জমি চাষ করিতে লোকের কত সময়ই না নষ্ট হয়, কত শক্তিই না অযথা ক্ষয় হয়! ঘোড়ার সাহায্যে যে জমি চাষ করিতে লাগে ছয় ঘণ্টা

ট্র্যাক্টরে সেই জমি চাষ করা যায় এক ঘণ্টারও কম সময়ে। এত অপচয়ের পর আমাদের কৃষকেরা দরিদ্র থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অপচয়ের জন্য কৃষিজাত পণ্য সস্তা হইতে পারে না। কৃষকদের নূতন কোন যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু যে যন্ত্র আছে তাহাতে শক্তি নিয়োগ করা।

আমাদের মোটরের ন্যায় ট্র্যাক্টরকেও আমরা যথাসম্ভব পাতলা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনর্থক ওজন বাড়াইয়া ইঞ্জিনের শক্তি নষ্ট করা কোন কালেই আমাদের ইচ্ছা নয়। তাই ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনকে যথাসম্ভব মজবুত, পাতলা ও সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দামও এমন করিয়াছিলাম যাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থও তাহা কিনিতে পারে। এজন্য প্রায় পনের বৎসর ইঞ্জিন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, ইহাতে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছে।

ট্র্যাক্টরের জন্য আমরা ভিন্ন কারখানা করিয়াছিলাম। এক কারখানায় দুইটি জিনিষ তৈয়ারী করা আমি সম্ভব বলিয়া মনে করি না। পূর্ব্বে একথা একাধিকবার বলিয়াছি। তাহা ছাড়া গাড়ীর ইঞ্জিনও ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিন বিভিন্ন কাজের জন্য তৈয়ারী। গাড়ীর ইঞ্জিনকে শুধু চলিতে হয়, কিন্তু ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনকে চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটিও কাটিতে হয়।

ইহা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। জমি চাষ করিতে কয়েকদিনের প্রয়োজন মাত্র—তা' জমি যত বড়ই হউক না কেন। চাষ হইয়া গেলে ইঞ্জিন যাহাতে বসিয়া না থাকে আমাদের সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইয়াছে। ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনকে কোন একটা স্থানে বসাইয়া যাহাতে যে-কোন কাজে লাগান যায়

তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। জমি চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিন দিয়া শস্য কাটা, মই দেওয়া, মিল চালান, এমন কি ছাপাখানার কাজ পর্য্যন্ত চালান যায়। একবার কয়লার আমদানী বন্ধ হওয়ায় ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিন দিয়া প্রেস চালাইয়া আমরা "ডিয়ারবর্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ট্র্যাক্টরও আমরা মোটর গাড়ীর পদ্ধতিতেই তৈয়ারী করি। বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কারখানায় তৈয়ারী করিয়া একস্থানে সবগুলি একত্র জুড়িয়া ট্র্যাক্টর করা হয়। এজন্য উহার দাম পড়ে খুব সস্তা। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় ট্র্যাক্টরের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়। তখন উহার দাম ছিল ৭৫০ ডলার। ১৯২২ সালে আমরা উহার মূল্য ৩৯৫ ডলার পর্য্যন্ত নামাইয়াছি; দাম আরও কত কমিবে তাহা এখনও বলিতে পারি না।

অদূর ভবিষ্যতে, খুব বেশী হইলেও আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে সকল কৃষকেরই ট্র্যাক্টর ব্যবহার করিতে হইবে এবং যাহারা ব্যবহার করিবে না তাহাদের কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া অন্য কাজে হাত দিতে হইবে। কারণ ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিলে খরচ এত কম পড়িবে যে পশুদ্বারা জমি চাষ করিয়া প্রতিযোগিতায় কিছুতেই পাড়িয়া উঠা যাইবে না। ট্র্যাক্টরের চাষে যে খরচ কম পড়ে যুদ্ধের সময়ই তাহা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে। ট্র্যাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য্য চালাইলে বৎসরে চব্বিশ পঁচিশ দিন কাজ করিলেই একজন সাধারণ কৃষকের সমস্ত কাজ হইয়া যাইবে। বাকী সময়টায় তাহারা অন্য কাজ করিতে পারিবে।

ট্র্যাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য্য ব্যবসায় হিসাবে চালাইলে খাদ্য দ্রব্যও খুব সস্তা হইবার কথা। তখন খাদ্যাভাবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না এবং গবর্ণমেণ্টকেও বসিয়া বসিয়া খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে না। তখনই হইবে গ্রামে গ্রামে, কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে ছোট ছোট মিল, ফ্যাক্টরী ও কারখানার উৎপত্তি, ধীরে ধীরে দেশে গড়িয়া উঠিবে কৃষক সমিতি। তখন নিজেরাই নিজেদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ বিদেশে চালান দিবে। এখন টেক্সাস্ অঞ্চলে যে গম উৎপন্ন হয় তাহা ময়দা করিবার জন্য পাঠান হয়, সিকাগো অথবা নিউইয়র্কে, পরে সেই ময়দাই অত্যধিক দরে টেক্সাসের লোকদের কিনিতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে ছোট ছোট ময়দার কল বসিলে টেক্সাসের অধিবাসীরা ময়দা পাইবে অতি সস্তা দরে।

কৃষি ও শিল্পের সহযোগিতা কিরূপে সম্ভব এবং উভয়ের সাহায্যে দারিদ্র্য কিরূপে দূর করা যায় তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে হইবেও তাহাই।

—বার—

দারিদ্র্যের প্রতিকার ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে। এখন বলিব দান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কথা। দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে দান-দাতব্যের কথাটা স্বতঃই উঠিয়া পড়ে। দারিদ্র্য না থাকিলে দানের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? কিন্তু প্রশ্ন এই, সভ্য জগতে দান খয়রাতের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আমি বলিতেছি না যে জগৎ হইতে দান দাতব্যের ব্যবস্থা উঠিয়া যাউক, মানুষ তাহার হৃদয় হইতে উদারতা বদান্যতা মুছিয়া দি'ক; বরং মনে করি মানুষের হৃদয়ের কোমল তন্ত্রী যেদিন মানুষের দুঃখে করুণ সুরে বাজিয়া না উঠিবে, প্রতিবেশীর দুঃখে কষ্টে যেদিন প্রতিবেশীর হৃদয় না কাঁদিবে, সেদিনই আসিবে সমাজের ও জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা।

আমি বলিতে চাই যে, দয়ার ন্যায় মহৎ গুণকেও আমরা টানিয়া আনিয়াছি অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া যদি তাহার ক্ষুধা নিবারণ করিতে চাই তবে ক্ষুধাকে সমূলে উৎপাটিত করি না কেন? দুঃখীর প্রতি যদি আমাদের প্রকৃত সহানুভূতি থাকে তাহা হইলে জগত হইতে দুঃখকে দূর করিতে প্রয়াস পাই না কেন? দুঃখীকে দান করা খুবই সহজ, কিন্তু দানকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তোলা তেমনই আবার কঠিন। দানকে

অপ্রয়োজনীয় করিতে হইলে আমাদের ব্যক্তিবিশেষের দুঃখের গণ্ডীর বাহিরে বহু দূরে তাকাইতে হইবে। কেবল তাহাকে সাময়িক ভাবে সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। দুঃখীকে সাহায্য করিবার লোক যথেষ্ট মিলে, কিন্তু চাই এমন লোক যাহারা দুঃখ দূর করিতে প্রয়াসী।

ব্যবসাদারী বদান্যতা অথবা ধরাবাঁধা নিয়মে দানশীলতার পক্ষপাতী আমি কোন দিনই নহি। ব্যবসাদারী বদান্যতা বদান্যতার কোমলতাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন দারিদ্রের সাহায্যের কথা হয় একটা বাঁধা বুলি—কথার কথা মাত্র।

খবরের কাগজে না ছাপাইয়াও দুঃখীকে দান, আর্ত্তকে সাহায্য করা চলে। অনাথ আশ্রমে যতশিশু সাহায্য পায় তাহার শতগুণ অধিক অনাথ বালক যে গৃহস্থের ঘরে মায়ামমতায়, স্নেহে-বাৎসল্যে প্রতিপালিত হইতেছে তাহার খবর কেহ রাখে কি? সমাজ সমবায় ব্যাঙ্ক করিয়া দরিদ্রদের যে ঋণ দিয়া কৃতার্থ করিতেছে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী লেনদেন যে হইতেছে পরিবারে পরিবারে, ঘরে ঘরে তাহার খোঁজ কয়জনে রাখে? এতদূর দেখিয়া শুনিয়াও দয়া, করুণাকে ব্যবসাদারী জিনিষ করিয়া তোলা কতদূর সমীচীন তাহাই বিবেচ্য।

ব্যবসাদারী করুণায় দরিদ্রের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয় বেশী। এই নেওয়ার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। ইহাতে গ্রহীতার হয় মর্য্যাদা হানি, তাহার চিত্তবৃত্তি হয় হীন। ধরাবাঁধা দানশীলতা কর্ম্মঠ লোককে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে, আত্মনির্ভরশীল লোককে পরমুখাপেক্ষী করে। আমেরিকায় একবার এইরূপ অবস্থা প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন গ্রহীতারা মনে করিত দানের

পাওয়াটায় যেন তাহাদের একটা অধিকার বা দাবী রহিয়াছে। অথচ যে অবস্থা দূর করিবার জন্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা দূর হয় নাই, কিংবা অভাব দূর করিবার একটা সুযোগ পাইয়াও দরিদ্র গ্রহীতারা আত্মনির্ভরশীল হইতে চেষ্টা করে নাই।

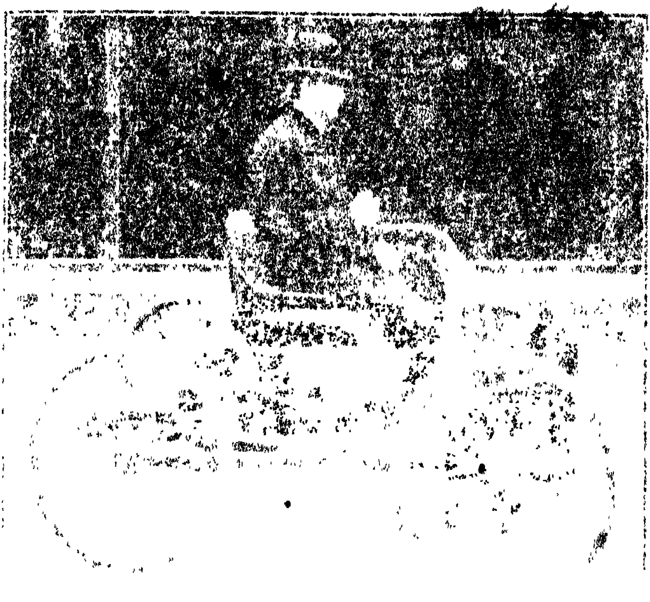
দান কখনও সমাজে শাস্তি, সমন্বয়তা আনিতে পারে না। গ্রহীতাকে সর্ব্বদা দাতার নিকট অবনত হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না হইলেই ওঠে আবার কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতার প্রশ্ন। গ্রহীতা চিরদিন গ্রহীতা হইয়া কখনও থাকিতে চাহে না। যে দান অভাবের মূলে আঘাত না করে সেই দানের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে সমাজের কোন লাভ হয় কি?

বর্ত্তমান শিল্প-জগতে দানের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। পূর্ব্বে আমি দেখাইয়াছি যে, আপাতঃ যাহাদের নিঃসহায়, উপার্জ্জনে অক্ষম—অন্ধ, খঞ্জ, আতুর ইত্যাদি—বলিয়া মনে হয় তাহাদেরও শিল্পোৎপাদনের জন্য কারখানার কাজে নিযুক্ত করা যায়। বিজ্ঞান যদি তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞান নামের অযোগ্য। বর্ত্তমান কারখানাগুলিতে কার্য্যের বিভাগ এত রহিয়াছে যে, উহাদের একটা না একটা বিভাগে যে-কোন লোক কাজ করিতে পারে। অন্ধ এবং খঞ্জের জন্যও কারখানাগুলিতে কাজের অভাব নাই। এতকাল সমাজ যাহাদের নিঃসহায়, সমাজের গলগ্রহ বলিয়া কৃপার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল বর্ত্তমান কারখানাগুলির দৌলতে তাহারাও একজন সুস্থ সবল-দেহ ব্যক্তির সমান অর্থ উপার্জ্জন ও পণ্যোৎপাদন করিতে সক্ষম। একজন খঞ্জ কিংবা অন্ধ যে কাজ করিতে পারে সেই কাজে একজন সুস্থদেহ ব্যক্তিকে

নিযুক্ত করা অন্যায়। অন্ধ ব্যক্তিদের বাঁশবেতের কাজে লাগান যে কতবড় ভুল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

জেলখানাগুলিতে সাধারণতঃ দেখা যায় কয়েদীদের ইট ভাঙিতে, দড়ি প্রস্তুত করিতে অথবা এইরকম ছোটখাটো কোন কাজ করিতে দেওয়া হয়। জেলের নিয়ম কি এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়? জেলখানাগুলি পরিচালনের ব্যবস্থা ভাল হইলে জেলের খরচ জেলখানা হইতেই উঠিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, কয়েদীদের এমন কাজে লাগান উচিত যাহাতে জেলে বসিয়াও তাহারা পরিবার প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয়। আর যাহাদের পরিবারের বালাই নাই তাহারাও এমন অর্থের সংস্থান করিতে পারে যাহাতে জেল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পরের গলগ্রহ হইয়া পড়িতে না হয়। তাই বলিয়া আমি কয়েদীদের কারখানার কাজে লাগাইতে বলিতেছি না। এই ব্যবস্থাকে আমি বরং ঘৃণাই করি। কিন্তু জেলের ভিতরেও পণ্যোৎপাদনের এইরূপ ব্যবস্থা করা যায় যে, তাহা জনসাধারণ ও কয়েদী উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েদীদের শুধু খাটাইবার জন্য জেলে কড়া আইন করা হয়—তাহাদের উপকারের জন্য নহে।

প্রকৃত সমাজ সেবার দিকে লক্ষ্য থাকিলে কখনও কাজের অভাব হয় না—অভাব যদিই হয়, হয় শুধু কাজ করিবার লোকের। সমাজের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা করিলে দান ও সমাজ-হিতৈষী প্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। দানের আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমাদের হইতে হইবে আত্মনির্ভরশীল। সেই সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাণবন্ত, যেখানে অসন্তুষ্টি সমাজকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যায়।



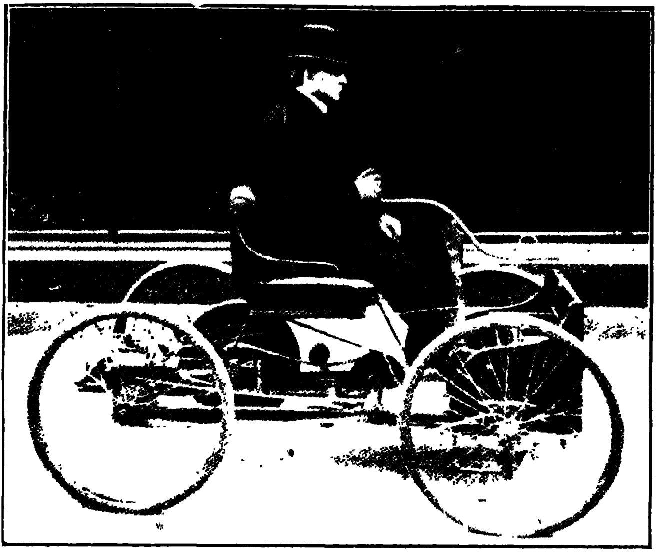


[illegible]

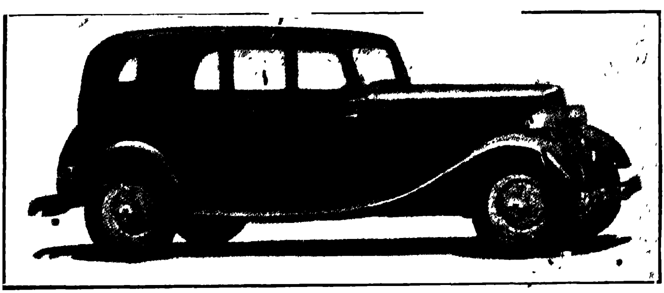
[illegible]

[illegible]

[illegible] যায়।



ফোর্ডের প্রথম গাড়ী



১৯৩৪ সালের মডেল

পরোপকার, দানশীলতা প্রভৃতি গুণকেও যথার্থ লাভজনক করিয়া তোলা যায়। আমার মনে হয় সেই প্রকার পরোপকারেরই সার্থকতা অধিক। এই নীতিতে আমি একটা স্কুল ও একটা হাসপাতাল চালাইতেছি। আমার চেষ্টাও যথেষ্ট ফলবতী হইয়াছে।

আমাদের স্কুলে ছাত্রদের হাতেকলমে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকি। এখানে বালকদের রীতিমত পণ্যোৎপাদন করিতে হয়। সাধারণ টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে দেখা যায় ছেলেদের পণ্যোৎপাদন শিক্ষা দিবার মোটেই ব্যবস্থা নাই। যে জিনিষগুলি তাহারা শিক্ষার সময় তৈয়ারী করে সেগুলিকে পরে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ইহাতে ছেলেদের জিনিষ তৈয়ারী করিবার দিকে সেরকম লক্ষ্য থাকে না; বাধ্যবাধকতার মধ্যে যতটুকু শিক্ষা করা সম্ভব শুধু ততটুকুই তাহারা শিখিতে পারে। এই সকল স্কুলে পড়িয়া বালকগণ স্বাবলম্বী হইতে পারে না। কাহারও দানের সাহায্য না পাইলে অর্থ লাভের সম্ভাবনাও তাহাদের থাকে না।

বালকদের শিল্পোৎপাদন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং তৎসঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যা শিখাইবার জন্য ১৯১৬ সালে আমি "হেনরী ফোর্ড ট্রেড" স্কুল খুলি। টাকার অভাবে যে সকল বালক পড়াশুনা করিতে পারে না তাহাদের জন্যই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্কুল স্থাপনের গোড়া হইতেই তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। প্রথমতঃ, বালক-ছাত্রদের বালকই রাখিতে হইবে, অকালে তাহাদের শ্রমিক করিয়া তুলিব না। দ্বিতীয়তঃ, কারখানায় পণ্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পড়াশুনাও করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ছেলেদের উৎপন্ন পণ্য ব্যবহার করিয়া তাহাদের ম

দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মগৌরব বোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বার বৎসর হইতে আঠার বৎসর বয়স্ক বালকদের আমাদের স্কুলে লওয়া হয়। স্কুলে বৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রত্যেক ছেলেকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চারি শত ডলার করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। যাহার কার্য্যের ফল সন্তোষজনক হয় তাহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া ছয় শত ডলার করা হয়।

প্রত্যেক ছেলের স্কুলের ও কারখানার কাজের খুব পাকাপাকি ভাবে হিসাব রাখা হয় এবং পরে বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার সময় কাজের হিসাব দেখিয়া বৃত্তি বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। বৃত্তি ছাড়াও সেভিংস ব্যাঙ্কে জমাইবার জন্য প্রত্যেক বালককে প্রতি মাসে কিছু কিছু করিয়া টাকা আমরা দিয়া থাকি। বালক যতদিন স্কুলে থাকে নেহাৎ বিপদের সময় ছাড়া উক্ত টাকা সে ব্যাঙ্ক হইতে তুলিতে পারে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের নিয়ম কানুনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল প্রত্যহ দুই ঘণ্টা পড়াশুনার পর চারি ঘণ্টা ছেলেদের কারখানায় কাজ করিতে হইবে। ইহাতে পড়াশুনা ও কাজ উভয়েরই ব্যাঘাত হইত। পরে নিয়ম করিয়াছি যে এক সপ্তাহ স্কুলে পড়ার পর দুই সপ্তাহ কারখানায় কাজ করিতে হইবে। এজন্য প্রত্যেক শ্রেণীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এক এক ভাগকে এক এক সময়ে কাজ করিতে হয়। ফোর্ড কোম্পানীর বিরাট কারখানায় কাজ করিয়া তাহাদের দেখিবার শুনিবার কোন যন্ত্রপাতিই বাকী থাকে না। হাতে কলমে কাজ শিখিয়া ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার বালকদের নখদর্পণে আসিয়া পড়ে। মানচিত্রে পৃথিবীর [illegible] একটা বিন্দুর মধ্যে দেখিয়া তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতে হয়

কারখানায় আসিয়া দেখে সেই সকল জায়গায় জিনিষপত্র যাইতেছে ও সেই সকল স্থান হইতে জিনিষ আসিতেছে। যন্ত্রের গতি নির্ণয় করিতে তাহাদের আর রহস্যময় 'ক' ও 'খ'য়ের গতির আঁক কষিতে হয় না। হাতের সামনে মেসিনের গতি দেখিয়াই তাহারা সব বুঝিতে পারে। বালকেরা কারখানায় যে কাজ করে ফোর্ড কোম্পানী তাহা কিনিয়া লয়। কোন কাজ খারাপ হইলে স্কুলেরই ক্ষতি।

কারখানায় কাজ শিখাইয়া আমরা বালকদের বালকত্ব ঘুচাইয়া দেই না। তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে যতটা দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ততটা দিয়া থাকেন। অনর্থক কখনও ছেলেদের ঘাড়ে কড়া শাসনের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় না। বালকের সরল বালকত্ব লইয়াই তাহারা ধীরে ধীরে মানুষ হয়। মারামারি, হুড়াহুড়ি করুক তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা জানি যে বালক বয়সে চপলতা থাকিবেই। তাহা দমন করিতে গেলেই তাহার স্বাভাবিক পরিণতিকে নষ্ট করা হয়। কিন্তু বালকগণ যাহাতে রাস্তায় যাইয়া ঝগড়াঝাটি, কলহ-বিবাদ না করে সে দিকে আমরা খুব লক্ষ্য রাখি। মোট-কথা, আমাদের স্কুলে বালকদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তাহাদের দেখিলেই মনে হয় যেন আত্মনির্ভরশীলতার দীপ্তি তাহাদের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছয়টি ছেলে লইয়া প্রথম আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন স্কুলে প্রায় সাত শত ছেলের পড়িবার ও কাজ শিখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রথম প্রথম স্কুলের ক্ষতি হইত, ছাত্রদের ... স্কুলের ব্যয় সাঙ্কুলান হইয়া উঠিত না। সুব্যবস্থার সঙ্গে

আমাদের হাসপাতালের ঘরগুলি সব এক রকমের। ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আমাদের হাসপাতালে নাই। কাহাকেও নিজের পছন্দসই ঘর দেওয়া হয় না। এক এক ব্লকে চব্বিশটি করিয়া কামরা। কর্ত্তৃপক্ষের চোখে আমাদের সব রোগীই সমান। কাহারও প্রতি ব্যবহারের তারতম্য আমরা করি না।

আমাদের দেশীয় হাসপাতালগুলিতে যে দোষত্রুটি রহিয়াছে আমরা সেগুলি যথাসাধ্য দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশের হাসপাতালগুলির যে অবস্থা তাহা দেখিয়া বুঝা কঠিন যে সেগুলি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে রোগীদের সাহায্যের জন্য না ডাক্তারদের সুবিধার জন্য। একদিকে বেশী পরিমাণ টাকা ব্যয় না করিলে তো সেখানে সুচিকিৎসা হওয়াই অসম্ভব, তাহা ছাড়া অনেক সময় রোগ নির্ণয়ও সেখানে সম্যকরূপে হয় কিনা সন্দেহ। একজন ডাক্তার যদি রোগ নির্ণয়ে কোন ভুল করেন ব্যবসার খাতিরে অথবা পদপ্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকে অন্য ডাক্তার তাহা কখনও সংশোধন করেন না। আরও চমৎকার যে, অনেক সময় রোগীকে রোগের অবস্থাই জানান হয় না। হাসপাতালে গেলেই যেন রোগী হইয়া পড়ে ডাক্তারদের সম্পত্তি। এমন অনেক ডাক্তার দেখা যায় যাহাদের নিকট রোগীর প্রাণ অপেক্ষা নিজেদের প্রেসকিপশনের উপর মায়া বেশী।

আমাদের হাসপাতালে সবই করা হয় ঘরোয়া ব্যাপারের মত, রোগীর রোগ ও প্রাণ লইয়া আমরা খেলা করি না। ডাক্তারদের আমরা শুধু হাসপাতালের কাজের জন্যই নিযুক্ত করি। হাসপাতালে আমরা বাহিরের ডাক্তার আনিতে দেই না—অবশ্য যাহাদের পারিবারিক চিকিৎসক আছে তাহাদের কথা আলাদা। সাধারণতঃ

বাহিরের লোক আমাদের রোগীদের কথা কিছু জানিতে পারে না কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসকদের সহযোগিতা আমরা সর্ব্বদা কামনা করি।

রোগীকে ভর্ত্তি করিবার সময় প্রথমেই একজন সিনিয়র চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা করেন। পরে প্রয়োজন মত তিন জন অথবা চারিজন ডাক্তারেও দেখিয়া থাকেন। প্রত্যেক ডাক্তার তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখিয়া বরাবর প্রধান চিকিৎসকের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি এইরূপ কয়েকটি পরীক্ষার ফল একত্রে হাতে পাইয়া রোগ নির্ণয়ে অনেকটা সুবিধা পান। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে রোগ নির্ণয় বেশীর ভাগই ঠিক হয়। প্রয়োজন হইলে ছয় সাত জন ডাক্তার দ্বারা রোগীকে পরীক্ষা করাইতেও কসুর হয় না।

বর্ত্তমানে আমাদের হাসপাতালে প্রায় ছয় শত রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রত্যেক রোগীকে যে টাকা দিতে হয় তাহা হইতে তাহার খাওয়া, থাকা, ঔষধপত্র, ডাক্তার ইত্যাদির সমস্ত খরচ বহন করা হয়। যদি কোন রোগীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়ে তাহা হইলেও তাহার জন্য রোগীকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না। সমস্তই ব্যবস্থা করা হয় হাসপাতাল হইতে। সাধারণতঃ আমরা প্রত্যেক সাতজন রোগীর জন্য একটি নার্স রাখি। প্রয়োজন হইলে একজনের জন্য একটি নার্স রাখিতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। প্রত্যেক রোগীর জন্য আমরা দৈনিক ফী লই প্রায় সাড়ে চার ডলার। হাসপাতাল বড় করিলে ও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে খরচ আরও কমিয়া যাইবে। হাসপাতালের কাজও চলে ঠিক

আমাদের কারখানার নিয়মে। রোগীদের নিকট হইতে আদায় করা অর্থেই হাসপাতালের খরচ চলে। যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে রোগীদের অধিক সুবিধা করিয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাতে দান-দাতব্যের কোন প্রকার সংস্রব নাই। আমাদের কারখানার মত এখানেও শুধু সুব্যবস্থার ব্যাপার। আইন কানুনও প্রায় এক রকমের। শুধু প্রভেদ এইটুকু যে হাসপাতাল হইতে আমরা লাভ করি না। এতাবদ্ হাসপাতালে আমাদের ব্যয় করা হইয়াছে প্রায় ৯০ লক্ষ ডলার।

আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছি, দান করিয়া যে অর্থ ব্যয় করি সেই অর্থ পণ্যোৎপাদনে লাগাইলে সস্তায় সাধারণের জন্য প্রচুর জিনিষ তৈয়ারী করা যায়। তাহাতে দেশের ঐশ্বর্য্যও বৃদ্ধি পায়। সমাজের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত কাজ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া করা উচিত সেইগুলি প্রায়ই আমরা ব্যক্তি বিশেষের জন্য ফেলিয়া রাখি। এজন্য চাই দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তি। সমাজে যে দানের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না সেই বিষয় ভাবিতে গেলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে এবং মন হইতে ভয় দূর করিতে হইবে। যাহার আত্মনির্ভরশীলতা আছে তাহার পরের সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই, পরের দানের জন্য সে লালায়িত নহে।

পরমুখাপেক্ষীতা হইতেই হয় ভয়ের উৎপত্তি। বাহিরের সাহায্যের আশায় যাহারা বসিয়া থাকে, পদে পদে তাহাদের আসে বাধাবিঘ্ন। কাজে যাহারা আত্মনিয়োগ করে তাহাদের চেষ্টা বিফল হয় না—হইতে পারে না। সফলতার পথে যে অসংখ্য প্রতিবন্ধক রহিয়াছে ভয়াতুর, পরনির্ভরশীল ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়াই বিচলিত হইয়া পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে তাহাদের চেষ্টার পরাজয় হয় না—হয় ভয়ের জয়লাভ। পৃথিবীতে কয়জন লোক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া বিফল হইয়াছে? সফলতা লাভের জন্য অর্থ ও প্রখর ধীশক্তির প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় ধৈর্য্যের, কাজে লাগিয়া থাকিবার অদম্য উৎসাহের। এখানেই সাফল্য। কাজে বিফল হওয়া খুবই সহজ, কিন্তু সফলতা লাভ করিতে হইলে চাই চেষ্টায় নিজেকে উজার করিয়া দেওয়া। সাফল্যের জন্য নিজেকে যে বিলাইয়া দেয়, সফলতা তাহার দ্বারে না আসিয়া পারে না। পরাজয়ের প্রত্যেকটি সোপান অতিক্রম করিয়া জয়ের পথে যে অগ্রসর হইয়াছে সে জানে অগ্রগতির পথে কত দোষত্রুটি ছিল তাহার নিজের—কাজের নয়।

যাহা হউক, মানুষ জগতে শ্রেষ্ঠ জীব। সফলতা বিফলতার মধ্যেও সে চিরদিনই মানুষ থাকিবে। বাহিরে না তাকাইয়া নিজের ভিতরের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই সে দেখিতে পাইবে অফুরন্ত অমূল্য ধনরাজি তাহার নিজের মধ্যে নিহিত আছে। সেইগুলি আহরণ করিবার একমাত্র উপায় ভয় ত্যাগ। আমেরিকার যুবকদের প্রতি আমার বক্তব্য, 'এই পরনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষীতা দূর কর, অলস সুখস্বপ্ন মনের নিগূঢ়তম কোণ হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেল; উন্নত বক্ষে একবার দাঁড়াও দেখি বীর—সাফল্য তোমার পায়ে না পড়িয়া পারে না। পঙ্গু দৌর্ব্বল্য ও ক্লীবত্ব যাহাদের পাইয়া বসিয়াছে পরের দানের আশায় তাহারা থাকুক।'

—তের—

আমার কোন রকম ভুল না হইয়া থাকিলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমরা চলিয়াছি প্রকাণ্ড একটা পরিবর্ত্তনের পথে। ধীরে, অতি ধীরে আমাদের চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। সামান্য লক্ষ্য করিলেই তাহা চোখে পড়ে। কথায় কথায় আমরা যাহাকে 'গোলমাল' বলি, প্রতিষ্ঠিত সমাজদেহে প্রতিনিয়ত যে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে দেখিতে পাই, তাহা নব নব জীবনের ক্ষুদ্র স্পন্দনের অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক বিষয়ে লোকের ধারণা নূতন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত অতীতের যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু অকল্যাণকর সেগুলিকে সুষ্ঠু করিয়া তোলা। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আমরা অতীতের গলিত সংস্কারগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছি। জগতের ও সমাজের প্রকৃত রূপ আমরা দেখিতে শিখিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি, পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন জগতে তাহার কোন জিনিষের অভাব নাই। এখনও যেটুকু জানিবার বুঝিবার বাকী আছে অদূর ভবিষ্যতে তাহাও জ্ঞানের আয়ত্তে আসিয়া পড়িবে।

অন্যায়কে যদি অন্যায় বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে উহার প্রতিকার সহজসাধ্য হয়। কিন্তু পরস্পরের দোষগুণ খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে গিয়া আমরা নিজেদের কাঁধে চাপাইয়াছি ভুলের একটা বিরাট বোঝা। সমাজের সমস্ত অন্যায়কে ব্যক্তি বিশেষের ঘাড়ে লইয়া চলা অসম্ভব। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনেও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। মানুষমাত্রেই স্বার্থপর, এজন্য আমাদের প্রতিযোগিতার কার্য্যাবলীও স্বার্থ বিজড়িত। স্বার্থ যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে ইহাকে দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত না। কিন্তু মানুষের যাহা স্বভাব-ধর্ম্ম, রক্তের প্রতি বিন্দুর সহিত যাহা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাহা দূর করা অসম্ভব। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন স্বার্থ থাকিবে, হিংসা থাকিবে, দ্বেষ থাকিবে।

কিন্তু আমাদের জীবনসংগ্রামের কঠোরতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলে হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তিগুলির নিদর্শন আমরা দেখাইতে পারি।

যাহাকে উন্নতি বলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন একটি সাধারণ ইয়াঙ্কি বালকের শুধু খেলার জন্য যে সরঞ্জাম থাকে সমগ্র এস্কিমো সম্প্রদায়ের মধ্যেও এত জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। একটি সাধারণ ইয়াঙ্কি পরিবারের আসবাব পত্র দেখিয়া পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের একজন ধনী ব্যক্তিরও চোখ ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইবে—অবশ্য তাঁহার পক্ষে দেখা সম্ভব হইলে। তুলনা হিসাবে এই কথাগুলি বলিতেছি। জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের

অভাববৃদ্ধি উন্নতির একটা স্তর মাত্র। কিন্তু এই সকল অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, খেলার সরঞ্জাম—যেগুলি সমাজের কোন উপকারেই আসে না—তৈয়ারী করিতে কত অর্থ, কত শক্তির অপচয় হয় তাহার খবর কে রাখে? শুভ লক্ষণ, বাহিরের জাঁকজমক ও অপচয়ের দিন ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। জগতের শিল্প কারখানাগুলির দৃষ্টি পড়িয়াছে সমাজের প্রকৃত সেবা ও সৌকর্য্যের দিকে।

অর্থ-দেবতার পূজার দিন ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। ধনী হওয়া, ব্যাঙ্কের হিসাবের অঙ্ক দিন দিন বাড়াইয়া তোলা এখন কেহ গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করে না। ধনী হওয়া যুবক আমেরিকার একমাত্র কাম্য নয়। ডলার হিসাবে ডলারের আদর এখন আর পূর্ব্বের মত নাই। যুবক ইয়াঙ্কির নিকট ধনী দেবতা বলিয়া সম্মান ও আদর পায় না। সঞ্চয়ের মোহের যুগ চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি বিশেষের টাকা জমাইবার কোন সার্থকতা নাই। তাহার সঞ্চিত অর্থ কোন কাজে আসে না।

ধনীও মানুষ, দরিদ্রও মানুষ, মানুষ হিসাবে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে দরিদ্রের যতটা জিনিষ প্রয়োজন ধনীরও ঠিক ততটা জিনিষেরই প্রয়োজন। পরিধানের জন্য ধনীর দশ গজ ও দরিদ্রের এক গজ কাপড় লাগে না—যদি লাগে তাহা হইলে ধনীর পক্ষে সেইটুকু করা হয় অপচয়। ধনীর শয়নের জন্য একটা ঘরেরই প্রয়োজন। এক সময়ে একাকী সে দশটা ঘরে থাকিতে পারে না। ধনীর যদি প্রকৃত সমাজ সেবার দিকে লক্ষ্য থাকে, সংসারকে সে যদি স্বর্গ করিয়া তুলিতে চায়, শিল্প কারখানার স্বার্থপূর্ণ মরুভূমিকে শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিবার বাসনা যদি তাহার হয় তাহা হইলে ডলারকে ডলার বলিয়া না দেখিয়া

সে দেখিবে ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির উপকরণ স্বরূপ। ভবিষ্যতের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে সে অর্থকে শস্যোৎপাদনের জন্য শস্যের বীজ বলিয়াই মনে করিবে। সূর্য্যের সঞ্জীবনীরশ্মির ন্যায় সে অর্থকে 'বহুজন হিতায়' 'বহুজন সুখায়' নিয়োজিত করিবে। সেখানেই হইবে ধনীর ধনের সার্থকতা।

জগতে দুই রকমের মূর্খ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল ধনী আছে, যাহারা মনে করে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহারা অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভে সমর্থ হইবে। আর একদল সংস্কারক আছে, যাহাদের অর্থের বালাই নাই, নিজেরা নিঃস্ব, যাহারা মনে করে যে ধনীর সঞ্চিত ধন তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া দরিদ্রের হাতে দিলেই সমাজের যত কিছু দারিদ্র্যজনিত দোষ-ত্রুটি একদিনে শোধরাইয়া যাইবে। এই দুই দলের উভয়েই চলিয়াছে বিরাট ভুলের দিকে।

অলসতা ও কর্ম্মবিমুখতার মধ্যে তাহারা সৃষ্টির যাদুকরী বিদ্যার ফল দেখিতে চায়। তাস-পাশা খেলিয়া দুনিয়ায় কে কবে অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছে? তাহাদের মনের ভাব অনেকটা এই রকমের। আমাদের সমসাময়িক অনেক লোক আছে যাহারা প্রভূত ধনের মালিক। কিন্তু এত অর্থের অধিকারী হইয়াও সমাজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সাহায্যকল্পে একতিলও তাহারা কিছু করে নাই।

সমাজের সকলেই যদি নিজের সাধ্যানুসারে, শক্তি অনুযায়ী ধনবৃদ্ধি ও পণ্যোৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে অভাব বলিয়া সমাজে কোন কিছু থাকিতে পারে না। মূলতঃ পণ্যোৎপাদনের

অভাবেই যত দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি, এই অভাবের মূলে রহিয়াছে জ্ঞানের অভাব, দূরদর্শীতা ও চিন্তাশক্তির অভাব

পণ্যোৎপাদন সম্পর্কে আমাদের গোড়াতেই কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত—

(ক) সুখস্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহের জন্য আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়।

(খ) পণ্যোৎপাদন ও শ্রমিককে বেতন দানের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সমাজের অভাব অভিযোগ দূর করা সম্ভব হয়।

(গ) মানুষের স্বভাবগত দোষ-ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন চেষ্টা করিলে শিল্প-কারখানা ও অর্থনৈতিক জগত হইতে তাহা দূর করা সম্ভব।

পণ্যোৎপাদন ও মাল সরবরাহে যাহারা বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয় ব্যবসা করা তাহাদের পক্ষেই সহজ হয়, আর যাহারা কোন প্রকার বুদ্ধি খরচ করে না ব্যবসা চিরদিনই তাহাদের নিকট কঠিন, দুর্ভেদ্য রহস্যজালে আবৃত থাকিয়া যায়। প্রায় সকলেই ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হয় লাভের জন্য। অর্থ করাই ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধারণাটা মস্ত ভুল। সমাজ ও দেশের সেবা করাই ব্যবসায়ীর লক্ষ্য থাকা উচিত। সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মধারার মধ্যে ব্যবসাও একটি ধারা ছাড়া কিছু নয়। প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায় ব্যবসায়েরও নিজস্ব রীতি আছে, নীতি আছে। সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

ব্যবসা নিজ হাতে অন্যায়কারীর দণ্ড বিধান করে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসার অঙ্গ হইতে সমস্ত গলদ, সমস্ত আবর্জনা দূর

হইবেই। যে মেসিন কাজের মধ্যে বারবার বন্ধ হইয়া যায় উহার কলকব্জায় গলদ রহিয়াছে নিশ্চয়। যে ব্যক্তি অনবরত অসুখে ভোগে পীড়া তাহার দেহে বাসা বাঁধিয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্যবসার দেহেও ঠিক সেইরূপ, উহার নীতিগত দোষত্রুটি উহাকে যে-কোন-সময়ে অসুস্থ করিয়া তোলে। তখনই বাজারে ব্যবসায়ের ঘাট্‌তি আরম্ভ হয়, বাজার 'মন্দা' বলিয়া চারিদিকে রব উঠে। কিন্তু এই ভাব আর বেশী দিন চলিবে বলিয়া মনে হয় না। অদূর ভবিষ্যতে সকলেই ব্যবসায়ের নীতিগত আইনকানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে।

ফোর্ড কোম্পানীর কার্য্য পদ্ধতির দ্বারা দেখা যায় ব্যবসার ক্ষেত্রে সাধারণের সেবাই মূল উদ্দেশ্য। লাভের দিকে তাকাইবার পূর্ব্বে এদিকে নজর দেওয়াই সকলের উচিত। সমাজ ও জনসেবা যে কর্ম্মধারার প্রধান উদ্দেশ্য সেই কর্ম্মধারা প্রকৃতই মহান, সেই কর্ম্মধারার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতই খুব বেশী।

ব্যবসায়ে আমাদের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই অনেকবার বলিয়াছে, দৈবক্রমে ফোর্ড কোম্পানীর এত লাভ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছে আমাদের কারখানার ও পণ্যোৎপাদনের নিয়ম প্রণালী শুধু আমাদের কোম্পানীর পক্ষেই খাটে। অন্যান্য কোম্পানীর পক্ষে এই নিয়মে কাজ করা সম্ভবপর কিংবা সুবিধা জনক নয়।

ব্যবসায়ী মহলে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের নিয়মপদ্ধতি অর্থ নৈতিক হিসাবে অত্যন্ত কাঁচা। আমাদের নীতি তাহারা বুঝিতে পারিত না বলিয়াই এইরূপ বলিত। আর যাহারা একটু ভাবিয়া দেখে তাহারা বলে, মোটর ব্যবসায়ে সম্ভব হইলেও অন্য কোন

ব্যবসায়ে ফোর্ড কোম্পানীর অনুসৃত নিয়ম মানিয়া চলা অসম্ভব। ফোর্ডের নিয়মে সেলাইয়ের কল, টাইপ রাইটার, ঘড়ি, টুপী, জুতা ইত্যাদির কারখানা চলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের অন্য কোন ব্যবসা থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, সকল ব্যবসায়েই এই নিয়ম খাটে। আমরা যাহা করিয়াছি তাহার কিছুই সহসা হয় নাই বা হাওয়ায় ভাসিয়া আসে নাই। আমরা এমন কিছুও করি নাই যাহা অপর কেহ করিতে পারিবে না। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকিলে ভাগ্য যতটুকু সুপ্রসন্ন হয় আমাদের ভাগ্যে তাহার অধিক কিছু জোটে নাই। বরং আমরা এক রকম কিছু হাতে না লইয়াই ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম। অনুসৃত নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসের বলেই আমরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। এতকাল যে জিনিষকে লোকে বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী বলিয়া মনে করিত আমরা তাহাকে করিয়া তুলিয়াছি অপরিহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। সুবিধার মধ্যে আমাদের শুধু এইটুকু ছিল যে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ নূতন করিয়া ভাবিয়া এইরূপ করিতে চেষ্টা করে নাই।

আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম নূতন পদ্ধতিতে। পরিবর্ত্তনকে অনেকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে। প্রচলিত নিয়ম-কানুন, আচার-পদ্ধতি, ভাবধারা আমাদের মনে এমন দাগ বসাইয়া দেয় যে সেই দাগ মুছিয়া ফেলা কষ্টসাধ্য হয়। এজন্য নূতনের প্রতি মানুষের মন সর্ব্বদা বিরূপ। কিন্তু আমরা নূতনকে কখনও সন্দেহের চক্ষে দেখি নাই। কাজের সুবিধার জন্য আমরা আমাদের যন্ত্রপাতি সর্ব্বদা নূতন করিয়া গড়িয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ফলদায়ক করিয়াছি।

এই নীতি অনুযায়ী কাজ না করিলে এতদিন আমরা কারখানা

চালাইতে পারিতাম না। অর্থকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কোনদিন কাজে অগ্রসর হই নাই। অর্থকে সেখানেই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছি যেখানে অর্থ আমাদের নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিয়াছে। আমরা মনে করি সেবাই ব্যবসার নীতি। যে ব্যবসার দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধিত হয় না সেই ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকাই শ্রেয়ঃ। ক্রেতাদের নিকট হইতে ব্যবসায়ী যে মূল্য গ্রহণ করিবে তদপেক্ষা অধিক দেওয়াই থাকিবে তাহার উদ্দেশ্য। আমার ব্যবসায়ে আমি তাহা দেখাইয়াছি। আমি দেখাইয়াছি, আমাদের ব্যবসায় সকলের জীবনযাত্রা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। শুধু মুখের কথায় দেশের দারিদ্র্য দূর হয় না, দারিদ্র্য দূর হয় কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধি দ্বারা।

আমাদের ব্যবসায়ের নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম—

(১) আমরা ভবিষ্যৎকে ভয় করি না কিংবা অতীতকে পূজা করি না। ভবিষ্যতের ভয় কার্য্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে মাত্র। বিফলতাকে আমরা ভয় করি নাই—ভয় করিয়াছি বিফল মনোরথ হওয়ার সাহস না-থাকাকে।

(২) প্রতিযোগিতার দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অপরের হাত হইতে ব্যবসাকে ছিনাইয়া আনিবার চেষ্টাকে আমি অপরাধ বলিয়া মনে করি।

(৩) লাভ অপেক্ষা সমাজ সেবা ও সাধারণের উপকারের দিকে লক্ষ্য দিয়াছি বেশী। ব্যবসায়ে লাভ করা দোষাবহ নহে। সুপরিচালিত

ব্যবসায়ে লাভ না হইয়া পারে না। কাজের পুরস্কার স্বরূপ লাভ আসিবেই। লাভ আমাদের কার্য্যের ফল।

(৪) কমদরে জিনিষ কিনিয়া অধিক দরে বিক্রয় করাকে আমরা ব্যবসা বলিয়া মনে করি না; উচিত মূল্যে কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া যথাসম্ভব সস্তায় পণ্য উৎপাদন করিয়া আমরা বিক্রয় করিয়াছি। ফট্‌কা খেলা ব্যবসায়ের উন্নতির পরিপন্থী।

বর্ত্তমান যুগে কাজকর্ম্ম করিবার যত সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না। উন্নতির পথ এখন চারিদিকে খোলা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন যুবক ব্যবসার ক্ষেত্রে নামিয়া যে নিয়ম-কানুন বিধি-ব্যবস্থা দেখিত এখন তাহা নাই। এখন চারিদিকে সঙ্ঘের উৎপত্তি হইয়াছে, চারিদিকেই বাঁধাবাঁধি নিয়ম হইয়াছে। এই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িয়া নবীন ব্যবসায়ীরা নিজের ইচ্ছামত কিছুই করিতে সক্ষম হয় না। তাই বলিয়া মানুষ 'মেসিন' নহে। তাহার নিজস্ব সত্ত্বা আছে। সঙ্ঘ-সমিতি কাহাকেও হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই। ইহার মধ্যেও নিজের ব্যক্তিত্ব দেখাইবার সুযোগ যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রচলিত নিয়ম প্রণালী হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, বুদ্ধিবলে ইহার মধ্যেও যথেষ্ট নূতন পন্থার সন্ধান করা যায়।

ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বা কর্ম্মক্ষমতার প্রসারতা বন্ধ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের কারখানাগুলির প্রবর্ত্তন করা হয় নাই; সাধারণ লোকে অভ্যাস বশতঃ কাজকর্ম্মে যে অপচয় করিয়া থাকে তাহা বন্ধ করিবার জন্যই কারখানার উৎপত্তি। যাহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যাহারা বুদ্ধিমান বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা তাহাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর, তাহাদের

উন্নতির সহায়ক। আবার এদিকে যাহারা অলস, কর্ম্ম-বিমুখ কলকারখানা তাহাদের ধ্বংশের হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী। যান্ত্রিক জগতে আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, অসাবধানতার স্থান নাই। কারখানার কঠোর আইন-কানুনের চাপে পড়িয়া যখন অলস ব্যক্তিও পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয় তখন তাহার উপকার ব্যতীত অপকার হয় না।

কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির দৌলতে আজ অতি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মক্ষমতাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান যত ত্রুটিশূন্যই হউক না কেন উহা পরিচালনের জন্য শক্তিমান ব্যক্তি চাই। পূর্ব্বে একটা কারখানায় যত লোকের প্রয়োজন হইত এখন প্রয়োজন হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক লোকের। কারখানার কাজ এখন বহু বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটির জন্য এমন লোক থাকা প্রয়োজন যাহারা স্বীয় চিন্তাশক্তি-বলে স্ব স্ব বিভাগের আরও উন্নতি সাধন করিতে পারে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জগতে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক পরিবর্ত্তন হইবে। এখনও ব্যবসায়ের জন্য কলকারখানা পরিচালনার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এরূপ আর অধিক দিন চলিবে না। প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। এখনও আমরা মনে করি প্রকৃতি দেবী পৃথিবীর যে স্থানে যে দ্রব্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহা অন্যত্র উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করা মনুষ্যশক্তির বাহিরে। আমরা খনি হইতে কয়লা উঠাইয়া থাকি, গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ারী করি। কিন্তু গাছ একবার কাটিয়া ফেলিলে আমাদের এক জীবনে সেখানে হয়তো আর এত

বড় গাছ হইবে না। এমন দিনও আসিতে পারে যেদিন পৃথিবীতে কয়লার অভাব ঘটিবে। তাই প্রকৃতির দানের জন্য আমাদের আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি, উহাকে আরও উন্নত প্রণালীতে উঠাইতে হইবে। আমার মনে হয় রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন জিনিষ আবিষ্কার হইবে যাহা ধাতু অপেক্ষা মজবুত। তখন আর আমাদের লোহা তামার জন্য ধরিত্রীর বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া বেড়াইতে হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলার কথা ধরা যাক্। সত্য বলিতে গেলে তুলার ব্যবহার আমরা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। কাঠের জন্য গাছ না কাটিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কাঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি। দেশসেবা ও জনসেবার স্পৃহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলে অনুসন্ধিৎসা আপনা হইতেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। আমাদের শুধু করিতে হইবে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ।

পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কোন কাজ নাই। আত্মবিশ্বাসের বলে আপাতঃ অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলা যায়।

পরিশিষ্ট

—ক—

অনুমান ১৮৮৭ সাল অথবা ইহারই কাছাকাছি একটা সময়ে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক টমাস এ-এডিসনের সহিত আমার প্রথম আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে। তখন আমি ডেট্রয় এডিসন কোম্পানীতে কাজ করি। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপার লইয়া যাঁহারা চর্চ্চা ও গবেষণা করিতেছিলেন সেই বৎসর তাঁহারা আটলাণ্টা সিটিতে একটা সম্মেলন আহ্বান করেন। মিঃ এডিসন আমন্ত্রিত হইয়া সভায় বক্তৃতা দেন—কারণ তিনিই ছিলেন বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের শিরোমণি। তখন মোটর ইঞ্জিনের ব্যাপার লইয়া দিনরাত্রি আমার পরীক্ষা চলিতেছে। সহযোগী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির নিকট তখন শুধু গালমন্দ খাইয়াই আসিতেছি। ভাবিলাম, মিঃ এডিসন তো বিজ্ঞ দূরদর্শী পুরুষ তাঁহাকে আমার চেষ্টার কথাটা বলিয়া দেখি না কেন? সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শুনিলেন। নূতন কিছু দেখিলে শুনিলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকিত না। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই গ্যাস্ ইঞ্জিন যদি হাল্কা ও বেশ শক্তিসম্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। একটা শক্তি

দ্বারা কখনও জগতের সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কতটা কি হইবে না হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। বেশ তো, প্রাণপণ লাগিয়া যাও। সফলকাম হও তো উহা দ্বারা জগতে অনেক কিছু করা যাইবে।" দূরদর্শী মিঃ এডিসন গ্যাস ইঞ্জিনের ভবিষ্যৎ বুঝিলেন। আজ এতকাল পরেও মিঃ এডিসনের সেই কথাগুলি আমার পরিষ্কার মনে পড়ে।

মিঃ এডিসনের সহিত সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। পরে যখন আবার আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন আমি মোটরের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু মিঃ এডিসন আমার কথা ঠিক মনে রাখিয়াছিলেন। তাহার পর প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমিয়া গিয়াছিল। অনেক জল্পনা কল্পনাই আমরা একত্রে বসিয়া করিয়াছি।

মিঃ এডিসনের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। অসম্ভব বলিয়া কোন কাজ জগতে আছে বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, বস্তুবিশেষ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই উহাকে আমাদের নিকট অসম্ভব করিয়া তোলে। জিনিষটা খুব ভাল করিয়া জানিয়া লইলে সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব হইয়া পড়ে। না জানিয়া শুনিয়া আন্দাজে পরিশ্রম করিলেই কাজে বিফলতা আসে। মিঃ এডিসন বাস্তবিকই ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক। তিনি যাহা ভাবিতেন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অসাধারণ ছিল। আজকাল এই জিনিষটারই অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মিঃ এডিসন ব্যবসায়ী না হইলেও অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি ও

ব্যবসায় পরিচালন উভয় কার্য্যেই তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

আরও একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত আমার বন্ধুত্ব করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিদেবীর অকৃত্রিম পূজারী জন বারোজ। জন বারোজ পাখী খুব ভালবাসিতেন। আমারও পাখী পুষিবার একটা বাতিক ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তাহা গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। পাখীর জন্ত আমি যথেষ্ট খরচ করিয়াছি—এমন কি দেশ বিদেশ হইতেও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রকারের পাখী আনাইয়াছি। এতকাল মিঃ বারোজের সহিত পরিচয় ছিল শুধু তাঁহার লেখার মারফত। তাঁহার লিখিত সবগুলি বই আমি পড়িয়াছিলাম। অভিনব ভাবে তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। তিনি ছিলেন যান্ত্রিক সভ্যতার ঘোর বিরোধী। রেল, কলকারখানা ইত্যাদি তিনি দুই চোখে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যান্ত্রিক সভ্যতা প্রকৃতির স্বভাব সৌন্দর্য্যকে কলুষিত ও বিসদৃশ করিয়া ফেলে। এখানেই ছিল আমার সঙ্গে তাঁহার মতের গড়মিল। আমি বুঝিতে পারিলাম তাঁহার ভাবাবেগ তাঁহাকে ভুল পথে লইয়া যাইতেছে। আমি তাঁহাকে আমার একখানা মোটর পাঠাইয়া লিখিলাম, তিনি যেন পরীক্ষা করিয়া দেখেন বিরাট প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগে গাড়ীখানা তাঁহার সহায় হয় কিনা। মোটর চালনা শিখিতে অবশ্য তাঁহার কয়েকদিন সময় লাগিয়াছিল কিন্তু ইহার পর হইতেই তাঁহার মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পায়ে হাঁটিয়া প্রকৃতির

যতটুকু তিনি উপভোগ করিতে পারিতেন গাড়ীর সাহায্যে তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী উপভোগ করিতে পারেন।

এখানেই আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। শেষ বয়সে মিঃ বারোজ দার্শনিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু এই বয়সেও নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে তাঁহার ব্যাঘাত ঘটে নাই। আমরণ তিনি জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়াই গিয়াছেন। পরিবর্ত্তনের সহিত নিজকে বিলাইয়া দিতে যে অক্ষম সে তো মরিয়াই রহিয়াছে। অন্তিম-শয্যা তাহার মরণের আর একটী অধ্যায় মাত্র।

মিঃ জন বারোজ মারা গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মরণে দুঃখ করিবার কিছু নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাজ করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়তমা প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে জীবনের ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন।

জন বারোজ, এডিসন ও আমি বহুবার ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। মোটর লইয়া, পথে তাঁবুতে রাত্রিবাস করিয়া আমরা এলিগানি পর্ব্বত পর্য্যন্ত টহল দিয়াছি। আজীবন এই আনন্দময় দিনগুলির কথা আমার মনে থাকিবে।

*　　*　　*　　*　　*

আজ আমি যুদ্ধবিগ্রহের ঘোর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছি—একমাত্র রাজনীতিবিদ্‌গণ ছাড়া অনেকেই বোধ হয় আমাকে সমর্থন করিবেন। যুদ্ধে কথনও কোন সমস্যার মীমাংসা হয় না। যুদ্ধের ফলেই জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থা উলট পালট হইয়া গিয়াছে; যুদ্ধের ফলে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে অনেকে কিন্তু দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে বহু লোক। কিন্তু প্রকৃত যাহারা

দেশপ্রেমিক, মাতৃভূমির প্রতি যাহাদের প্রকৃত ভালবাসা আছে তাহারা কি কখনও ভাইয়ের আত্মবলির শোণিত-তর্পণে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে? দেশের জন্য প্রাণ দিতে গিয়া সৈন্যরা যতদিন অর্থ করিতে না পারে, বুকের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়া মাতা যতদিন অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম না হয় ততদিন কাহারও অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়।

ব্যবসায়ে সততা যাহাদের লক্ষ্য থাকে যুদ্ধের সময় তাহারা কখনও লাভবান হইতে পারে না। শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যবসায়ের প্রসারের একমাত্র পথ। যুদ্ধের সময় সমাজ ও দেশের হিতকর কোন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি?

জগতে একদল লোকই—আছে এবং তাহাদের হাতে ক্ষমতাও যথেষ্ট, যাহারা আরও অধিকতর লাভের জন্য সর্ব্বদা জগতকে যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। যুদ্ধ বাধিলেই জগতে ঘটে একটা বিরাট বিপর্য্যয়। অতএব দেখা যায় যুদ্ধের ফলে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে মানুষই তাহার স্রষ্টা। এজন্য প্রয়োজন হয় শুধু বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করা। বিদ্বেষের বীজ একবার বপন করিতে পারিলে যুদ্ধ বাধিতে আর বিলম্ব হয় না। এমন লোকও বিরল নহে যাহারা ইউরোপের মহাযুদ্ধে খুবই আনন্দিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের উপশমেই যাহাদের মনে বিষাদ জাগিয়াছে।

একটা মহান জাতির মহত্ত্ব কোথায়, কোন গুণ জাতিকে পৃথিবীর বুকে বড় করিয়া তোলে তাহা জানা থাকিলে কোন জাতিই বোধ হয় সহজে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে যাইত না। কলকারখানা, কৃষি শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য দেশকে বড় করে না।

জাতির সকলে যখন সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, অভাব অভিযোগ যখন সকলেরই কম থাকে তখনই জাতিকে ও দেশকে বলা চলে প্রকৃত সমৃদ্ধশালী।

সম্প্রতি পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিয়া যে একটা কথা উঠিয়াছে তাহা শুধু কথার মারপ্যাচ ও ছলনা মাত্র। জগতের প্রত্যেক জাতি যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে সকলেরই তাহা কামনা হওয়া উচিত। প্রত্যেক দেশ নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে পারিলে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে পারিবে বেশী। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যে সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন হয় শীত প্রধান দেশে তাহা কোন উপায়ে উৎপাদন করিতে পারিলেও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় উহার আঁটিয়া উঠা অসম্ভব। পাশ্চাত্যের সহিত চায়ের এবং দক্ষিণ আমেরিকার সহিত রবার উৎপাদনে আমরা কখনও আঁটিয়া উঠিতে সক্ষম হইব না। অপেক্ষাকৃত উন্নতজাতিগুলির অজ্ঞতার সুযোগ লইয়াই আমরা বিদেশী বাণিজ্য চালাইয়া থাকি। স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই অনুন্নত দেশসমূহকে আমরা অনুন্নত রাখিয়া দেই। আমাদের প্রতিবেশী মেক্সিকোর কথাই ধরা যাউক। মেক্সিকোর উন্নতির কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মেক্সিকোতে প্রকৃতপক্ষে করা হয় কি? উহাকে উন্নতি না বলিয়া শোষণ বলিলে কি অন্যায় হয়? বিদেশী ধনিক মেক্সিকোকে ধনে প্রাণে শোষণ করিয়া মারিতেছে। বিদেশীদের লোলুপ আকাঙ্ক্ষার মুখে দেশীয় লোকেরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। বিদেশী বণিকদের স্বার্থ মেক্সিকোর অধিবাসীদের উন্নতির পথে প্রধান

প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকেই কি বলে মেক্সিকোর উন্নতি? দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশীয় লোকদের উন্নতি সাধন করা প্রথমে প্রয়োজন। মানবতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে ইহাই করা উচিত। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি স্বাবলম্বী হইলে বর্ত্তমান বাণিজ্যের একটু বিপর্য্যয় ঘটিবে বটে কিন্তু এই ভাবেই বা জগৎ চলিবে কয়দিন! ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আমাদের চাহিয়া দেখা উচিত জগৎজোড়া সভ্যতার দিকে।

পরস্পরের সাহায্যের প্রবৃত্তি হইতেই ব্যবসা বাণিজ্যের উৎপত্তি। আমার দেশে যে জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় নিজের ব্যবহারের পরিমাণ দ্রব্য রাখিয়া বাকীটা যে দেশে সেই জিনিষ উৎপন্ন হয় না তথায় প্রেরণ করিবার সদিচ্ছা হইতেই বাণিজ্যের প্রচলন হয়। জগতের সমস্ত দেশ স্বাবলম্বী হইলে হইবেও তাহাই। তখন আর প্রতিযোগিতা-দ্বন্দ্ব থাকিবে না। নিগ্রো-স্বাধীনতার জন্মদাতা প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলিতেন, 'জাতির দেহের অর্দ্ধেক সুস্থ অর্দ্ধেক অসুস্থ হইয়া বেশীদিন বাঁচিতে পারে না।' মানব সমাজেও সেইরূপ অর্দ্ধেক নিপীড়ক অর্দ্ধেক নিপীড়িত হইয়া বেশীদিন থাকিতে পারে না। যতদিন এইরূপ থাকিবে ততদিন বুঝিতে হইবে জগতে উলট-পালট ঘটিবেই।

প্রত্যেক দেশেরই প্রত্যেক দেশকে কিছু না কিছু দিবার আছে। অযথা কামড়াকামড়ি না করিয়া যদি আমরা সেই আদান-প্রদানের অবস্থায় ফিরিতে পারি তাহা হইলেই আন্তর্জাতিক সম্মান বোধ জাগিবে, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপিত হইবে। ব্যবসায়ের বাজার

দখল করিবার চেষ্টার ফল যুদ্ধ-বিগ্রহ। ইহাতে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে না।

ইউরোপের মহাসমরের কোনরূপ সম্মানজনক কারণ ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যুদ্ধের ফলে নিজেরা লাভবান হইবে আশা করিয়াই কতিপয় ব্যক্তি যুদ্ধ বাধাইয়া ছিল। আগে আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে শুনিলাম কয়েকটি দেশ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সময়ে শান্তি স্থাপনের একটা চেষ্টা করিলেই যুদ্ধ থামিয়া যাইবে। এজন্য ১৯১৭ সালে আমেরিকা হইতে বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি "শান্তি জাহাজ" লইয়া ইউরোপে গমন করেন। আমিও সেই সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম সংবাদ ভুল। পৈশাচিক জিঘাংসায় ইউরোপ তখনও রণোন্মাদে উন্মত্ত। কিন্তু ১৯১৬ সালে যদি যুদ্ধ থামিত তাহা হইলে জগতের অবস্থা আজও এইরূপ থাকিত না।

যুক্তরাষ্ট্র যখন যুদ্ধে যোগদান করে তখন ভাবিলাম যুদ্ধ শেষ করিবার জন্যই আমেরিকা যুদ্ধে যাইতেছে। কিন্তু পরে বুঝিলাম যুদ্ধে কখনও যুদ্ধের শান্তি হয় না। আগুন একবার জ্বলিলে বড় আগুন দিয়া তাহা নিভাইতে যাওয়া ভুল। যুদ্ধ না লাগিয়া উঠা পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তির উচিত যুদ্ধে যোগদানে দেশকে বাধা দেওয়া। আমি শান্তিপ্রিয় বলিয়াই শুধু যুদ্ধবিরোধী নই। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে যুদ্ধ ছাড়া তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যুদ্ধে কখনও সমস্যার সমাধা হয় কি কখনও না। যুদ্ধে ক্লান্ত অবসন্ন

হইয়া প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় আসে যখন সমস্যা-মীমাংসায় সকলেই রাজী হয়।

আমেরিকা যখন যুদ্ধে যোগদান করিল তখন ফোর্ড কোম্পানীকে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে আমরা যুদ্ধমান কোন জাতির নিকট হইতেই কোন জিনিষের অর্ডার লই নাই। পরে যুদ্ধ স্থগিত হওয়া মাত্রই আমরা পুনরায় শান্তিপূর্ণ কাজে ফিরিয়া আসিলাম।

* * * * *

ইতিহাসের কতকগুলি সন তারিখ যে মুখস্থ রাখিয়াছে, বড় বড় পুঁথিপত্র হইতে যে কয়েকটা কথা আওড়াইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে পারে তাহাকে আমি শিক্ষিত বলি না। যে করিতকর্ম্মা লোক, কার্য্য করিবার যাহার ক্ষমতা রহিয়াছে সেই শিক্ষিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেখিয়া আমি শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিচার করি না। চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই আমি শিক্ষিতের পর্য্যায়ভুক্ত করি। চিন্তা করিতে শিক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ। এজন্যই বোধ হয় জগতে চিন্তাশীল ব্যক্তির এত অভাব, কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত কোনটাই ভাল নহে। অনেকে হয়তো স্কুলের শিক্ষার প্রতি বিদ্রূপ করিবে আবার অনেকে হয়তো বা স্কুলের সমস্ত সোপান অতিক্রম ছাড়া শিক্ষার উপায় দেখিবে না। তাহা হইলে উভয়েরই ধারণা ভুল বলিতে হইবে। স্কুল হইতে যেমন শিখিবার রহিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে শিক্ষা লাভ করিবার তাহা অপেক্ষা বিশেষ কিছু কম নাই। যে শিক্ষা শুধু অধ্যাপকদের নোট মুখস্থ না করাইয়া শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দেয় তাহাই প্রকৃত

শিক্ষা। স্কুল কলেজগুলি এজন্য শিক্ষার পক্ষে সহায়ক মাত্র। প্রকৃত শিক্ষার স্থান স্কুল কলেজের বাহিরে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সংসারের ন্যায়-অন্যায় মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তোলে।

শিক্ষা ও জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বহুদূর প্রসারী। ইহার সীমা পরিসীমা নাই। সমাজের রুচির উপর, সমাজের গতির উপর, সংসর্গের উপর রুচি বিভেদ হয়। আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি বাইবেল যাঁহার খুব ভাল জানা থাকিত তিনিই শিক্ষিত বলিয়া সমাজে ও দেশে আদর পাইতেন। কিন্তু এখন বাইবেলের শিক্ষার উপর চলিবে কি ? আমার মতে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা সমন্বয়ঘটিত জ্ঞান থাকাই বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনা যাহাদের আছে তাহারাই এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম। সমস্ত জীবন ভরিয়া পুঁথির পর পুঁথি ঘাটিয়া তথ্য সংগ্রহ করিলেই শুধু শিক্ষিত হওয়া যায় না। তাহাতে শুধু মাথাটা হয় একটা ঘটনাবলী পুঁজি করিবার বাক্স মাত্র। একজন লোক অনেক বিষয় জানিয়া শুনিয়াও নিষ্কর্ম্মা অকেজো হইতে পারে আবার একজনের পক্ষে কিছু না জানিয়াও বিশেষ কাজের লোক হইতে বাধা নাই, চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাইতে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অনেক সময় দেখা যায় অফুরন্ত ঘটনাবলীর জ্ঞানের বোঝা যাহার মাথায় চাপিয়া বসে নাই, সেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারে বেশী।

জগতের উপকার সাধনে, জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে তুমি কতটা কি করিতে পার, আমি কতটা কি করিতে পারি ? এই

প্রশ্নই হইবে শিক্ষার মাপকাঠি। ইহার উত্তরে যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে সেই প্রকৃত শিক্ষিত, প্রকৃত জ্ঞানী। যদি সে ব্যক্তি নিজের চিন্তাশক্তির উদ্ভাবনের ফলে আরও দশজনকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে বলিব আরও শিক্ষিত। অগণিত পুস্তকের কোন্ পৃষ্ঠায় কি লেখা রহিয়াছে তাহা সে না জানিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জ্ঞানের অভাব আছে বলা চলে না। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে যে প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, সত্য বলিতে গেলে সে-ই সংসারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করিয়াছে।

—খ—

ডিমোক্রেশী—'গণতন্ত্র, 'সাধারণ তন্ত্র' এই সব কথাগুলি এতলোকে এতভাবে কপচাইয়াছে, এমন ভাবে নিঙ্ড়াইয়াছে যে এখন আর ইহাদের ভিতরে মৌলিকত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যাঁহারা 'গণতন্ত্র, গণতন্ত্র' বলিয়া চীৎকার করে বেশী গলদও তাহাদের মধ্যেই ততবেশী। আমার মনে হয়, তাহারা চাহে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করিতে এবং যে কাজটা তাহাদের নিজেদের করা উচিত তাহা অন্যের দ্বারা করাইয়া জগতে বাহাবা লইতে। প্রকৃত পক্ষে সমাজ সেবার দিকে যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে, উহাই যদি জীবনের ব্রত হয় তাহা হইলে

গবর্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক হইল না রাজতান্ত্রিক হইল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি ? আর সমাজে ধনিক ও শ্রমিকের রেষারেষির ব্যাপার লইয়াই বা কামড়াকামড়ি করিবার প্রয়োজন কোথায় ?

কিন্তু যখন দেখি সমাজে সকল মানুষ সকল মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করে না, তখন বাস্তবিক লজ্জায় ও দুঃখে মাথা হেট হইয়া যায়। এখানেই উঠে ধনিক ও শ্রমিকের প্রশ্ন। এখানেই উঠে ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নানা প্রকার অভিযোগ। কিন্তু কথাটা কি ঠিক ? সমাজকে কি এই দুই ভাগে ভাগ করা চলে ? শুধু ধনী ও দরিদ্র লইয়াই সমাজ সৃষ্ট হয় নাই ; ধনীও নহে দরিদ্রও নহে, সমাজে এই শ্রেণীর লোকও যথেষ্ট রহিয়াছে এবং তাহারাই সমাজের মেরুদণ্ড। সমাজের সকলেই যদি ধনী হইত তাহা হইলে ধনীদেরও কাজ করিতে হইত—কাজ করিয়া রুটির ব্যবস্থা করিতে হইত। সমাজে থাকিতে হইলে কাহারও কাহারও কাজ করিতে হইবেই। অতএব শ্রেণী বিভাগ করাটা এক হিসাবে শুধু কথার কথা মাত্র।

ধনিক সম্প্রদায়ের একখানা কাগজ খুলিলে দেখা যায় শ্রমিকদের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করা হইয়াছে, আবার শ্রমিকদের একখানা কাগজ খুলিলে দেখা যায় ধনিকদের শ্রাদ্ধ করিয়া তাহারা ছাড়িয়াছে। তাহাদের পরস্পরের প্রতি উক্তির মধ্যে সত্যও যে কিছু না আছে তাহা নহে। যে ধনিক ব্যবসায়ে শুধু মূলধন দিয়াই খালাস, যে শুধু বসিয়া বসিয়া শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির লাভের অংশ খায় তাহার প্রতি শ্রমিকদের উক্তি শোভাপায়। কিন্তু যাহাই হউক, এই

যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত মনোভাব, পরস্পরের সহিত পরস্পরের দ্বন্দ্ব ইহার উৎস কোথায়? ধনিকগণ নিজেরা কখনও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কিছু লেখে না। একদল লোকই আছে যাহারা কলওয়ালাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া বেড়ায়। শ্রমিকদের পক্ষেও তেমনি একদল লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধিতে ধনিকদের বিরুদ্ধে কলম চালায়। মিথ্যা প্রচারে উভয় পক্ষই সমান দোষে দোষী। কিন্তু এইরূপ প্রচার কার্য্যের জের অধিক দিন চলিবে বলিয়া মনে হয় না। ধনিক যদি বলে, 'হে শ্রমিক তুমি আরও পরিশ্রম করিয়া আমার লাভের মাত্রা বাড়াও' তাহা হইলে যেমন অন্যায় হয়, তেমনি শ্রমিক যদি বলে, 'আমি কাজ কম করিব কিন্তু, বেতন চাই বেশী' তাহাও তেমনি অন্যায় হয়। উভয় পক্ষের এইরূপ উক্তিই আত্ম-ধ্বংসী।

এখানে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ধর্ম্মঘটের কথা ধরা যাউক।

প্রত্যেক ইউনিয়নে এমন কতকগুলি লোক রহিয়াছে প্রচার করাই যাহাদের কাজ। এজন্য ইউনিয়ন হইতে তাহারা বেশ মোটা বেতনও পায়। এই সকল লোকের প্রভুত্বও শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট। শ্রমিকদের প্রদত্ত সুযোগেই তাহারা প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে বেশী, নচেৎ নিজের ক্ষমতায় প্রভুত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে তাহারা হয়তো বহুদূরে পড়িয়া থাকিত। সুযোগ ও প্রভুত্বের সদ্ব্যবহার তাহারা কখনও করে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই সকল শ্রমিক-নেতা যদি সততা ও বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিত তাহা হইলে এতদিন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অবস্থা হয়তো অন্যরূপ হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হইবার নয়। গোলমালের পর গোলমাল

বাধাইয়া তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সতত চেষ্টিত। শান্তি স্থাপিত হইলে তাহাদের আর প্রয়োজন কি?

ধ্বংস, ধর্ম্মঘটও অভাবের পথে শ্রমিকদের না লইয়া গিয়া যাহারা তাহাদের কাজ ও মজুরী বৃদ্ধির উপায় দেখাইয়া দেয় তাহারাই প্রকৃত শ্রমিক নেতা। কিন্তু ইউনিয়নগুলির অবস্থা আর বেশীদিন এইরূপ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তথাকথিত শ্রমিক-নেতাদের ইউনিয়ন যেদিন লোপ পাইবে সেইদিন তথাকথিত ধনিকদের নেতৃত্বও লোপ পাইবে। অনেক সময় দেখা যায় ধনিকগণ স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের সুখ সুবিধার দিকে তাকায় না—যদি বা কখনও তাকায় তাহা হইলে তাকাইতে বাধ্য হয় বলিয়াই তাকায়। মূর্খ অদূরদর্শী ধনিকদের প্রধান শিক্ষাদাতা শ্রমিক ইউনিয়ন, আবার তেমনি স্বার্থপর শ্রমিক ইউনিয়নের শিক্ষাদাতা উক্ত ধনিকগণ। এক জনের রোগে আর একজন চিকিৎসক বিশেষ। সুব্যবস্থিত কারখানায় তাহাদের কাহারও স্থান হইতে পাবে না। এজন্য উভয়েরই এক সঙ্গে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। এখন হইতে শ্রমিক ধনিকের একযোগে কাজ করিতে হইবে; তাহারা নিজেরাই তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবে—বাহিরের লোকে নহে।

কোন গোলমালের সুযোগ পাইলে স্বার্থসিদ্ধি করাই বর্ত্তমানে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির উদ্দেশ্য। প্রকৃত সমস্যা মীমাংসার দিকে উহাদের কোন লক্ষ্য নাই। সমস্যা মীমাংসার স্থলে উহারা এইরূপ কতকগুলি মিথ্যা উপায় অবলম্বন করে যে তাহাতে কখনও প্রকৃত সমাধান সম্ভবপর হয় না। বরং অভিযোগের পর অভিযোগ বাড়িয়াই চলে।

শ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম বলিয়া আমি কখনও উহার বিরোধী নহি। সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য যে সঙ্ঘ যে সমিতিই করা হউক আমি তাহারই পক্ষপাতী।

সমাজের দিকে, নিজেদের দিকে চাহিয়া শ্রমিকদেরও কতকগুলি বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। তাহারা প্রায়ই বলিয়া থাকে কম কাজ করা সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক, ইহাতে অন্য লোকের কাজের সুবিধা হয়। ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মক ধারণা আর কি হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া মনে হয় যেন বসিয়া থাকিলেই কাজ হইবে। অলসতার সৃজনশক্তি আছে কি? ইহাতে শুধু অভাবের বোঝা বাড়ে মাত্র। প্রকৃত যে শ্রমিক সে কখনও অন্য শ্রমিককে বলিবে না 'কম কাজ কর'। তাহার উদ্দেশ্য থাকিবে অধিকতর কাজ করিবার উপায় উদ্ভাবন করা এবং তাহাতে আরও অধিক সংখ্যক লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একজন কম কাজ করিলে অন্যের সুবিধা হইবে এই ধারণাটা অনেক বিবেচক, বিচক্ষণ ব্যক্তিও সমীচীন বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য কি? যে কারখানায় লোকজন তাহাদের নিয়মিত কাজ করিয়া যায় সেখানেই ব্যবসা চলে ভাল এবং শ্রমিকগণ জীবিকার্জ্জনের বহুবিধ সুযোগ পায়। যে দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সততা বর্ত্তমান সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও স্বভাবতঃই সুস্থ ও নিরাপদ।

পূর্ব্বে যে কাজের জন্য দশজন লোক নিযুক্ত করা হইত এখন যদি সেই কাজের জন্য নয় জন নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে ইহা মনে করা অন্যায় যে অতিরিক্ত লোকটি বেকার হইয়া পড়িল। তাহাকে উক্ত কাজ হইতে বাদ দেওয়ার অর্থ জনসাধারণ ও ক্রেতাকে পণ্যের

জন্য অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করা হইতে রেহাই দেওয়া। কারণ কারখানায় যে কাজই হউক না কেন উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয় জনসাধারণকে। যে কারখানা পরিচালনে সুব্যবস্থা রহিয়াছে, পণ্যের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য লওয়া যে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নহে, সেখানে উক্ত অতিরিক্ত ব্যক্তির কাজের কখনও অভাব হয় না। সুব্যবস্থিত কারখানার বিস্তৃতি হওয়া এবং উহার কাজ বৃদ্ধি পাওয়া সুনিশ্চিত। একজন লোককে কোন একটা বিশেষ কাজ হইতে বাদ দিয়া যে তাহাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করা যাইবে না ইহার কোন অর্থ নাই। যে কারখানায় সুব্যবস্থার অভাব সেখানেই যে কাজে কম লোকের প্রয়োজন সেখানে বেশী লোকের দরকার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানে দুনিয়ার বাজারে যে উলট পালট ঘটিতেছে তাহারও কারণ কারখানায় অব্যবস্থা।

দিনের কাজ বলিতে শুধু কারখানায় আট ঘণ্টা কাটাইয়া দেওয়া বুঝায় না। কাজের জন্য শ্রমিককে যে বেতন দেওয়া হয় কাজ করিয়া তাহার সেই পরিমাণ পণ্যোৎপাদন করা প্রয়োজন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই কাজে অব্যবস্থা আসিতে বাধ্য। শ্রমিক অধিক বেতন পাইয়া কাজ কম করিলে যেরূপ অব্যবস্থা হয়, ধনিক শ্রমিককে অধিক খাটাইয়া কম বেতন দিলেও ঠিক সেই প্রকার অব্যবস্থাই ঘটে। আর যখন সমস্ত দেশময় এই ব্যাপার ছড়াইয়া পড়ে তখনই হয় একটা উলট-পালট।

কারখানার কাজে সামঞ্জস্যের অভাব হইতেই ব্যবসায়ের ব্যাপারে যত রকমের গোলমাল উপস্থিত হয়। কার্য্য পরিচালনার ভার

যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারা এবং শ্রমিক উভয়েই এই গোলযোগের জন্য দায়ী। যেখানে হয়তো একশত লোক হইলে কাজ চলে কর্তৃপক্ষ সেখানে হয়তো বা পাঁচশত লোক লাগাইলেন। এদিকে কারখানায় যে ত্রুটি তাহা রহিয়াই গেল। বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীর অবস্থাও খারাপ হইতে বেশী দিন লাগিল না।

প্রকৃতপক্ষে শুধু দাবী-দাওয়া করিয়া কখনও বিশেষ কিছু লাভ হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মঘটে কোন দিন সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। আপাতঃ যাহাকে ধর্ম্মঘটের সাফল্য বলিয়া মনে হয় পরিণামে হয়তো তাহাতে সাফল্যের কিছুই দেখা যায় না। যে ধর্ম্মঘট শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া কাজের মাত্রা কমাইয়া দেয় তাহার ভার বহন করিতে হয় পরিণামে জনসাধারণকে ও ক্রেতাদের। ধর্ম্মঘট যে সর্ব্বদাই অন্যায় বা উহার কোন উপকার নাই তাহা আমি বলিতেছি না। ধর্ম্মঘটীরা অনেক সময় অনেক অন্যায় অবিচার কর্ত্তৃপক্ষকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। ন্যায্য কারণে ন্যায্য ফললাভ করিবার জন্য ধর্ম্মঘটকে আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য যে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিতে হয় তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সকল ধর্ম্মঘটগুলি হয় শুধু ধনিকদের দোষে। অনেক ধনিক, অনেক কারখানার মালিক তাহাদের পদের উপযুক্ত মোটেই নয়। শ্রমিকের যাহা ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য দাবী, কাজ হইতেই তাহার উহা পাওয়া উচিত। প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার কার্য্য অনুসারে পুরস্কৃত করা বা তাহার বেতন ঠিক করা খুব সোজা কাজ নহে। শ্রমিক যেমন তাহার কাজে অনুপযুক্ত হইতে পারে, কারখানার মালিকও তেমনি

আমাদের ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানায় একবার শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্ম্মঘট করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টার কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই ইউনিয়নের সদস্য। কিন্তু শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিতে অস্বীকার করায় তাহাদের নাম ইউনিয়ন হইতে কাটিয়া দেওয়া হয়। পরে শুনিয়াছি বিতাড়িত শ্রমিকগণ তাহাদের "বেনিফিট ফণ্ডের" টাকার জন্য ইউনিয়নের নামে মামলা করিয়াছিল।

আমাদের কারখানার শ্রমিকদের সহিত আমাদের শুধু দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিবার সময় আমরা শ্রমিকদের পারিবারিক জীবন যাত্রার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। এজন্য স্থায়ী আমরা কিছু করি নাই। কারখানার কাজ চালাইবার জন্য শ্রমিকে-শ্রমিকে, শ্রমিকে-মালিকে সদ্ভাব থাকা প্রয়োজন একথা আমরা মনে করি না। বড় বড় কোম্পানী গুলিতে এইরূপ হওয়াও অসম্ভব। সেখানে কোন ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্ব থাকে না। সকলেই কোম্পানীর সহিত নিজের অস্তিত্ব বিলাইয়া দেয়। সেখানে শ্রমিক ও মালিক সকলেই কারখানার বিশালতার মধ্যে ডুবিয়া যায়।

যে কারখানার উপর শত শত, সহস্র সহস্র পরিবারের জীবিকার্জ্জনের উপায় নির্ভর করে সেই কারখানার সহিত পবিত্র কর্ত্তব্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ। শত শত বালক-বালিকার বিদ্যাশিক্ষা, শত শত যুবক-যুবতীর দাম্পত্যজীবন, শত শত গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া কার মনে না হয় যে কারখানার কর্ত্তব্য অতি মহান?

কারখানার কাজে শ্রমিকদের পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্যের

কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহাতে বরং কর্ম্মপ্রীতি অপেক্ষা বন্ধুপ্রীতি জাগিয়া উঠে বেশী, ফলে কারখানার কাজের হয় যথেষ্ট ক্ষতি। এই কারণে বলিতে পারি যে, ধনিকের শ্রমিককে, শ্রমিকের মালিককে ভালবাসিতে হইবে, তাহাদের পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য রাখিতে হইবে এই ধারণার কোন অর্থ নাই। ব্যবসায় জগতে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, সকলে সকলের প্রতি ন্যায্য আচরণ করিয়া যাইবে। এখানেই ব্যবসায়ের ডিমোক্রেশী—গণতান্ত্রিকতা। কারখানার ইট পাথর, কল-কব্জার মালিক কে হইবে প্রকৃত ডিমোক্রেশীর অর্থ তাহা নহে।

